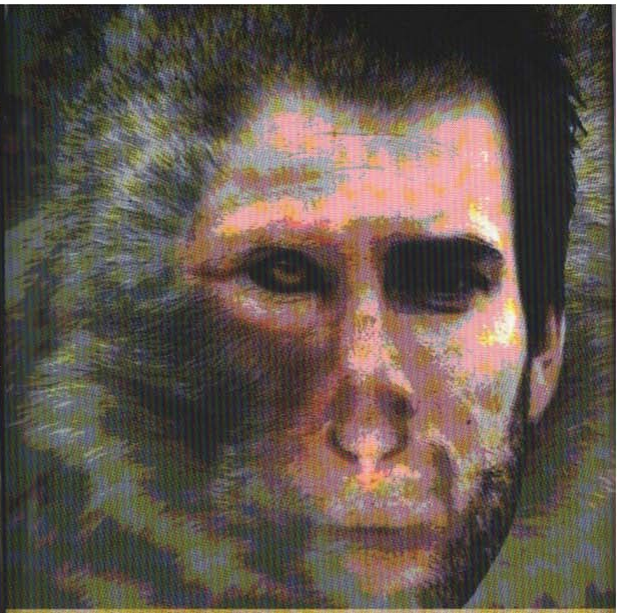

জীববিবর্তন সাধারণ পাঠ

ফ্রান্সিসকো জে. আয়ালা

ভাষান্তর

অনন্ত বিজয় দাশ

সিদ্ধার্থ ধর

জীববিবর্তন সাধারণ পাঠ | ভাষান্তর: অনন্ত বিজয় দাশ ও সিদ্ধার্থ ধর

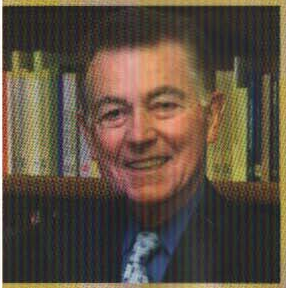

ফ্রান্সিসকো জে. আয়ালা

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেশবিদ্যা ও বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। ড. আয়ালা একজন খ্যাতিমান মার্কিন বিজ্ঞানী, গবেষক-শিক্ষকই শুধু নন, তিনি বর্তমান সময়ের একজন জনপ্রিয় বিজ্ঞানবক্তাও বটে। পশ্চিমা দুনিয়ায় জীববিবর্তনের বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের প্রচারিত সৃষ্টিবাদ, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন নামের ছদ্মবিজ্ঞানগুলোর তীব্র সমালোচক। এ বিষয়ে নানা বইও লিখেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের জীববিজ্ঞানের পাঠ্যসূচির বই লিখেছেন অনেকগুলো। একই সাথে বিজ্ঞান-আগ্রহী সাধারণ পাঠকদের জন্য আয়ালার উ. খযোগ্য বই হচ্ছে 'Darwin's Gift to Science and Religion' এবং 'Darwin and Intelligent Design'।

সবমিলিয়ে আয়ালার ৯৫০টির উপর প্রকাশনা রয়েছে, যার মধ্যে গ্রন্থের সংখ্যা ৩০টি।

অনন্ত বিজয় দাশ

জন্ম সিলেটে, ৬ অক্টোবর, ১৯৮২।
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার ছোটকাগজ যুক্তি'র সম্পাদক। আগ্রহের বিষয় জীববিবর্তন, বিজ্ঞানের সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞানের ইতিহাস।
প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ :
পার্থিব (সহলেখক সৈকত চৌধুরী), শুদ্ধস্বর, ২০১১। *ডারউইন : একুশ শতকে প্রাসঙ্গিকতা এবং ভাবনা* (সম্পাদিত), অবসর, ২০১১। *সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান ও বিপ্লব: লিসেঙ্কো অধ্যায়*, শুদ্ধস্বর, ২০১২।

সিদ্ধার্থ ধর

জন্ম সিলেটে, ৪ নভেম্বর, ১৯৮৯।
শিক্ষার্থী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ছোটকাগজ যুক্তি'র লেখক। সদস্য, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল, সিলেট।

প্রচ্ছদ | তৌহিন হাসান

জীববিবর্তন সাধারণ পাঠ

ফ্রান্সিসকো জে. আয়ালা

ভাষান্তর

অনন্ত বিজয় দাশ
সিদ্ধার্থ ধর

চৈতন্য

জীববিবর্তন সাধারণ পাঠ
ফ্রান্সিসকো জে. আয়ালা
'*Am I a Monkey?: Six Big Questions about Evolution*'
গ্রন্থের ভাষান্তর
অনন্ত বিজয় দাশ
সিদ্ধার্থ ধর

স্বত্ব : অনন্ত বিজয় দাশ

প্রকাশক
চৈতন্য
বারুতখানা, সিলেট
itzchoitonno@yahoo.com
০১৭১৮ ২৮৪৮৫৯, ০১৭১৪ ৬১০০৬১
প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৪
মুদ্রণ চৈতন্য মুদ্রণ শাখা

প্রচ্ছদ তৌহিন হাসান

১৮০ টাকা

Jibobiborton Sadharon Path, a translation of '*Am I a Monkey?: Six Big Questions about Evolution*' By Ananta Bijoy Dash & Siddharta Dhar.
Published by **CHAITANYA** Prokashon, Date of published: February 2014.
TK 180 Only, USD $ 10.00 only
ISBN 978-984-90509-6-4

বরেণ্য নিসর্গবিদ
দ্বিজেন শর্মা
স্যার'কে

'আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥'

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানের পঙ্‌ক্তিমালা থেকে মহাবিশ্বের জীবজগতের অসীম বৈচিত্র্যের ধারণাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের প্রকৃতিতে যে প্রাণবৈচিত্র্য বিদ্যমান রবীন্দ্রনাথ সেটা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন–এটা যেমন সত্য, এর পাশাপাশি প্রাচীনকাল থেকেই অনেক প্রকৃতি-বিজ্ঞানী জীবজগতের বৈচিত্র্য উন্মোচনের জন্য ক্লান্তিহীন পরিশ্রম আর মেধা ও মননের সংযোজন ঘটিয়েছেন। সত্যনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জীববৈচিত্র্যের বিশাল ভাণ্ডার আর তার গতিশীল সব তথ্য। একটু খেয়াল করলে এই তথ্যভাণ্ডারের সাহায্যে আমরা দেখতে পাই অতিক্ষুদ্র অণুজীব থেকে শুরু করে বিশাল আকৃতির প্রাণী আর মানুষের মধ্যে সর্বত্র বৈচিত্র্যের সমারোহ। জীবজগতে বিদ্যমান এই বৈচিত্র্য তথা বিভিন্নতা সৃষ্টির মূল কারণ অনেক গবেষণালব্ধ ফলাফলে ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

জীবজগতের বিচিত্র সব বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে যেমন কৌতূহলের সৃষ্টি করে তেমনি সৌরজগৎ, জীবন, পৃথিবী, মানুষ তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কিভাবে উৎপত্তি ঘটল–এ নিয়ে মানুষের অন্তহীন আগ্রহ দীর্ঘকালের। ক্রমান্বয়ে মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার একাগ্রতা দিয়ে জটিল এই বিষয়বস্তুকে অনুধাবন করার চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে সাফল্যও এসেছে প্রচুর, তারপরও অনেক অজানা বিষয় নিয়ে সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস এতটুকুও কমেনি বরং ভবিষ্যতে এই বিজ্ঞানচর্চা কখনোই থেমে থাকবে না।

জীবকুলে যে বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করছি তা কোনো অবস্থাতেই একদিনে সৃষ্টি হয়নি। আদিকালে সৃষ্ট সর্বস্তরের জীবের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য

পরিলক্ষিত হয়েছিল তা শতকোটি বছর ধরে বিকাশ লাভ করেছে এবং বর্তমানে বিদ্যমান তাদের সব প্রজাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। কালের পরিক্রমায় অনেকে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে আবার অনেক নতুন প্রজাতির উদ্ভবও হয়েছে। এককথায় বলা চলে এই বৈচিত্র্য সৃষ্টির মূল চালিকা শক্তি হলো 'জীবজগতের বিবর্তন'। জীববিবর্তনের মূল প্রতিপাদ্য হলো পৃথিবীতে সৃষ্ট মানুষসহ সকল জীব ইতোপূর্বে সৃষ্ট ওই সকল জীবেরই উত্তরসূরি। অণুজীব থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সকল স্তরের জীবের মধ্যে বিবর্তন ক্রিয়াশীল। বিবর্তন একটি বা দুটি প্রজন্মে সংঘটিত হতে পারে না–এটি সুদীর্ঘ এবং বিকাশপ্রবণভাবে অর্জিত হয়।

জীবজগতের বিবর্তনকে সঠিকভাবে জানার জন্য বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞানের প্রয়োজন। তাই জীবজগতের রহস্য উপলব্ধি করার জন্য জীববিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয় হিসাবে বিবর্তনবিদ্যার চর্চা এবং এ সম্পর্কে সাম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক।

যে বিষয়টির জন্য এই আলোচনার সূত্রপাত সেটি হলো বিবর্তনবিদ্যা সম্পর্কিত একটি অনুবাদ গ্রন্থ। অনন্ত বিজয় দাশ এবং সিদ্ধার্থ ধর, দুই বন্ধু মিলে অত্যন্ত সুচারুরূপে নিষ্ঠার সাথে ফ্রান্সিসকো জে. আয়ালার লিখিত *'Am I a Monkey?: Six Big Questions about Evolution'* গ্রন্থটির *'জীববিবর্তন : সাধারণ পাঠ'* শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ গ্রন্থটি মূলত কিশোর পাঠকদের উদ্দেশ্য করে রচনা করা হয়েছে। বইটি সাধারণভাবে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে বিবর্তনবিদ্যা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ এমন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমি বিস্তারিত কোনো আলোচনা করবো না, তবে এতটুকু উল্লেখ্য যে বিবর্তন সম্পর্কিত অনেক জটিল ধারণাকে খুব সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। বিবর্তন নিয়ে অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাবেন পাঠকেরা। বিশেষভাবে নবীন পাঠকগণ বিবর্তন নিয়ে ভাবনার অনেক উপাদানের সন্ধান পাবেন।

বিবর্তনবিদ্যার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। বিবর্তনবিদ্যা নিয়ে কৌতূহল ও আগ্রহের অন্ত নেই। বিবর্তন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা প্রসারিত হয়েছে। বংশগতিবিদ্যার কল্যাণে বিশেষ করে ডিএনএ অণু আবিষ্কারের পর থেকে বিবর্তনের ধারণার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সংযোজন ঘটেছে এবং এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও যৌক্তিকতা ক্রমান্বয়ে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই

অনুবাদ-গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে এ-বিষয়ে যথেষ্ট উপাদান সংযোজিত হয়েছে। আমরা আমাদের প্রয়োজনে জীবজগতের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল তাতে সন্দেহ নেই। আর প্রয়োজনের তাগিদেই আমরা জীবজগতের মধ্যে বিশেষ করে প্রাণী ও ফসল-উদ্ভিদের মধ্যে নানা বৈশিষ্ট্যের সন্নিবেশ ঘটাচ্ছি। আমরা অনেক ধরনের জীবের মধ্যে কৃত্রিম নির্বাচন ঘটাচ্ছি। এইসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে। কাজেই বিবর্তনকে জানা আমাদের জন্য আবশ্যকীয় একটি বিষয়।

এরপরও বিবর্তনকে নিয়ে অহেতুক বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো অনেক বিতর্ক সৃষ্টি করা হবে। এমন কী বিবর্তনবাদ চর্চাকে রোধ করার জন্য পাঠপুস্তক থেকে বিবর্তন সম্পর্কীয় ধারণা ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এটা সত্য যে জীববিদ্যায় বিবর্তনবিদ্যা একটা মৌলিক বিষয়। কাজেই এ বিষয়টিকে রোধ করে আমরা বিজ্ঞানকে বিকশিত করতে পারবো না। বৈচিত্র্যময় জীবজগতের উৎপত্তি, এর ক্রমবিকাশ, প্রকৃতিতে জীবের টিকে থাকার অন্তহীন সংগ্রাম–এসব কিছু আমরা অবজ্ঞা করে থাকতে পারবো না।

আশা করছি অনুবাদ-গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে আমাদের পাঠকদের মধ্যে বিবর্তনের ধারণাকে উৎসাহিত করবে। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত অনেক গ্রন্থের পাশাপাশি মাতৃভাষায় অনূদিত এই বইটি আমাদেরকে বিবর্তনবিদ্যা সম্পর্কে আধুনিক তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করবে। বিশেষ করে তরুণ-কিশোর পাঠক-সমাজ এই গ্রন্থের মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন এই কামনা করছি। আর তা হলে এই অনুবাদকদ্বয়ের প্রয়াস সার্থক হবে।

১০-০২-২০১৪

অধ্যাপক রাখহরি সরকার
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে মহাবিশ্বের কার্যপ্রণালীকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, জীবজগতে এমন ধারণার সূচনা ঘটিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইন একটি বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সাধন করেন। দীর্ঘদিনের গবেষণা, অনুসন্ধান, অভিযানের শেষে জীবের বিবর্তনের পক্ষে তিনি অনেক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হাজির করেছিলেন। এর থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচন নামের এমন একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন যা দিয়ে জীবজগতের 'গঠন-নকশা' ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ জীবের অভিযোজন, বৈচিত্র্যময় জটিল প্রজাতির আদি ইতিহাস, এমন কী মানুষের উদ্ভবকেও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে পরিচালিত একটি ক্রমান্বয়িক পরিবর্তন প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে যে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের উন্মেষ হয়েছিল আমাদের এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে, প্রাকৃতিক নিয়মেই পরিচালিত হয় এই গোটা বিশ্বজগৎ। কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীর আবিষ্কারগুলো একটি মৌলিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটায়। মানুষের চিন্তাজগতে, জ্ঞানের জগতে মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে, বিশেষ করে এমন একটি দাবির প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, যার দ্বারা মহাবিশ্বের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলোকে অনুসরণ করে যে কোনো প্রাকৃতিক প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু জীবজগতের বৈচিত্র্য, এদের অভিযোজন বিষয়ে তখন পর্যন্ত এরকম কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটেনি।

জীবজগতের নিয়ন্ত্রণের পিছনে নকশা বা পরিকল্পনার উপস্থিতির ভাবনা থেকে আপাতদৃষ্টিতে একজন পরিকল্পকের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। সেই পরিকল্পকের নির্দেশনায় আমাদের দেখার জন্য চোখ, উড়ার জন্য পাখা, সাঁতার কাটার জন্য পাখনা, সালোকসংশ্লেষণের জন্য ক্লোরোফিলের অস্তিত্ব রয়েছে বলে ভাবা হতো এককালে। বিজ্ঞানের বিষয় বলুন আর জ্ঞানের অন্য কোনো শাখার কথাই বলুন, মহাবিশ্ব নিয়ে আদতে মানুষের ধারণা উনবিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত দুই প্রান্তে বিভক্ত ছিল। প্রাকৃতিক নিয়মের বৈজ্ঞানিক

ব্যাখ্যাগুলো শুধু জড়বস্তুর জগতের জন্য প্রযোজ্য আর পৃথিবীতে-মহাকাশে একজন ঈশ্বর কিংবা অন্য কোনো অপ্রাকৃত সত্তার হস্তক্ষেপ জীবজগতের উৎস আর ক্রিয়ার পেছনে মুখ্য ছিল।

ডারউইনের প্রতিভাময় আবিষ্কারের ফলে দীর্ঘদিনের সেই চিন্তাবৈকল্য এবং বৈপরীত্যময় ভাবনা দূর করা সম্ভব হয়েছিল। 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' আবিষ্কারের মাধ্যমে জীববিজ্ঞানেও পদার্থবিজ্ঞানের মতো ধারণাচিত্র তৈরি করে; অলৌকিক সত্তার নির্দেশনা ত্যাগ করে মানুষ তার নিজস্ব যুক্তিতে জীবজগতের প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচন বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম তত্ত্বগুলোর মধ্যে একটি আর চার্লস ডারউইনও সর্বকালের অন্যতম প্রভাববিস্তারকারী বিজ্ঞানীদের একজন হয়ে ওঠেন।

এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে জীববিবর্তন তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই আধুনিক জীববিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে উঠেছে। অসংখ্য প্রজাতির মধ্যেকার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করে জীববিবর্তন তত্ত্ব। পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভব এবং অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষের জৈবিক যোগসূত্রের পেছনে জীববিবর্তন দায়ী। ক্রমাগতভাবে বিবর্তিত হয়ে চলা ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জীবের পেছনে এবং এদের সৃষ্ট রোগব্যাধির বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানজগতে এই তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জীববিবর্তন সম্পর্কিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কৃষি, ওষুধ এবং জৈবপ্রযুক্তিতে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

অথচ দুঃখজনক হচ্ছে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয়, বিশ্বের অনেক দেশের অনেক সাধারণ মানুষের কাছে জীববিবর্তন এখনো একটি বিতর্কিত এবং সন্দেহযুক্ত তত্ত্ব। সর্বমহলে বিজ্ঞানের এই তত্ত্বকে মেনে নিতে আপত্তি দেখা যায়। মানুষের এই ধরনের অপ্রাকৃতের প্রতি ঝোঁকে পড়া দৃষ্টিভঙ্গি-ভাবনা সত্যিই আমাকে বিস্মিত করে। চিন্তিত করে ফেলে। একজন পেশাদার জীববিজ্ঞানী এবং বিবর্তনবিদ হিসেবে আমি আমার সারাটা জীবন জীববিবর্তন এবং এর পেছনে মূল ভূমিকা পালনকারী প্রক্রিয়াগুলোর গবেষণায় উৎসর্গ করেছি।

মানুষসহ সকল জীব তাদের থেকে ভিন্নতর পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এ বিষয়ে এখন আর কোনো বৈজ্ঞানিক সন্দেহ নেই। সূর্যকে যেমন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, গ্যালক্সিগুলোর সম্প্রসারণ, পদার্থের পরমাণু তত্ত্ব

এবং জৈবিক উত্তরাধিকারের জিনেটিক তত্ত্বের মতো যুগান্তকারী ডারউইনের জীববিবর্তন তত্ত্বকেও জীববিজ্ঞানীরা একই নির্ভরতায় গ্রহণ করেছেন।

'*অ্যাম আই আ মাঙ্কি?*' বইটিতে বিবর্তন তত্ত্বের কিছু কেন্দ্রীয় ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে যেগুলো প্রায়শ মানুষের মনে উদয় হয়। তাই এই বইটি রচনার সময় আমি যথাসম্ভব দুইটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছি। প্রথমত বিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের খুব চমৎকার এবং সফল একটি পন্থা। কিন্তু এটাই হয়তো একমাত্র নয়। আরও অন্যান্য উৎস থেকেও জ্ঞান আহরিত হতে পারে। যেমন সাধারণ জ্ঞানের অভিজ্ঞতা, স্বজ্ঞা, সাহিত্য, সংগীত, শৈল্পিক অভিজ্ঞতা, দার্শনিক প্রতিফলন এবং মানুষের বিশ্বাস, ধর্ম। দ্বিতীয়ত, এই বইয়ের সর্বশেষ অধ্যায় উৎসর্গ করেছি প্রথম অধ্যায়টিকে–বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে দ্বন্দ্ব তৈরি করার প্রয়োজন নেই। যদি উভয় বিষয়টিকে ভালোভাবে বুঝতে পারা যায় তবে উভয়ের মধ্যে আর সংঘাত থাকে না। কারণ বিজ্ঞান আর ধর্ম দুটো আলাদা বিষয়। তারপরও এই আলাদা বিষয়গুলো খুব সফলভাবে এবং বৈশ্বিকভাবে আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে। বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কিছুটা অসম্পূর্ণ, বস্তুর মূল্য আর অর্থ বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে। জীবনের অর্থ, উদ্দেশ্য, নৈতিকতা, ধর্মীয়বোধ–এগুলোর জন্য আমাদের বাইরের দিকে তাকাতে হয়। এই দুনিয়ার বহু মানুষের কাছে এই প্রশ্নগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের থেকেও। আবার এই বিশাল সংখ্যক মানুষকে এড়িয়ে যাওয়ারও সুযোগ নেই আমাদের।

অধ্যাপক ফ্রান্সিসকো জে. আয়ালা
প্রতিবেশবিদ্যা ও বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান বিভাগ
ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, এরভিন
আমেরিকা।

আজ থেকে প্রায় বছর চারেক ইন্টারনেটে জীববিবর্তন নিয়ে সাম্প্রতিক কিছু লেখার খোঁজ করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে অধ্যাপক ফ্রান্সিসকো জে. আয়ালার লেখার সাথে আমরা প্রথম পরিচিত হই। আগ্রহের বশে ড. আয়ালার লেখাগুলো পড়া শুরু করি। জীববিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সহজ সাবলীল ভাষায় উপস্থাপনের যে বিশেষ দক্ষতা ড. আয়ালার লেখার মধ্যে পাই তাতে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখার প্রতি আমাদের গভীর আকর্ষণ তৈরি হয়। ফলে বিভিন্ন ওয়েব সাইট থেকে আয়ালার লেখা একাধিক ই-বুক নামিয়ে পড়া শুরু করি। পাশাপাশি পরিচিতজনের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আয়ালার একাধিক বই যোগাড় করি। আয়ালার লেখা বই পাঠ করতে গিয়ে আমাদের নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে একাধিক দিন।

এরপর একদিন অ্যামাজন সাইট ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত '*Am I a Monkey?: Six Big Questions about Evolution*' (২০১০) নামের ড. আয়ালার লেখা বইটির খোঁজ পাই। বইয়ের নাম এবং এর সূচি দেখে কেন জানি বইটি পড়ার প্রতি আগ্রহ জন্মে। সেই সূত্রে তাঁকে একটি ইমেইল প্রেরণ করি। দুদিনের মাথায় ফিরতি ইমেইলে ড. আয়ালা ওই বইয়ের ই-বুক ভার্সন আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। '*অ্যাম আই আ মাঙ্কি*' বইটা যদিও কিশোর বয়সীদের জন্য উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে তথাপি আয়ালার মতো একজন স্বনামধন্য বিজ্ঞানীর লেখনীর জোরে এটা সব বয়সীদের জন্য পাঠোপযোগী বলা যায় নিঃসন্দেহে। বইটি পাঠ করে আমরা দুজনে অনুবাদের সিদ্ধান্ত নিই এবং অনুমতি

প্রার্থনার জন্য লেখকের সাথে পুনর্বার যোগাযোগ করি। ড. আয়ালা তাৎক্ষণিকভাবেই আমাদের আবেদনে রাজি হন এবং নিজে উদ্যোগী হয়ে বইটির প্রকাশক জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি প্রেসের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন।

মূলত ড. আয়ালা এবং তাঁর সহকারী ডেনিসি চিলকোটের সমর্থন এবং উৎসাহের কারণে আমরা দ্রুতই অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি পেয়ে যাই। অনুবাদ চলাকালীন সময়ে অধ্যাপক আয়ালার সহকারী মূল বইটির রচনায় ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি ছবিও আলাদা করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। এমন কী বইটিতে ব্যবহৃত অধ্যাপক আয়ালার ছবিও তিনি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ বিষয়গুলি বইটির মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অধ্যাপক ড. ফ্রান্সিসকো জে আয়ালাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। আমাদের মতো নগন্য দুজন অপেশাদার অনুবাদকের জন্য অধ্যাপক আয়ালা যে অপরিসীম ঔদার্য প্রদর্শন করেছেন, নিজের চরম ব্যস্ত সময়ের মধ্যে থেকেও তিনি যে বিশাল আগ্রহ এবং নিরলস সহযোগিতা করে গেছেন দীর্ঘ সময় ধরে, তাতে আমরা সত্যিই অভিভূত, মুগ্ধ। সেইসাথে অবশ্যই কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রাখহরি সরকার ফ্রান্সিসকো আয়ালার বইটি অনুবাদের কথা শুনে আগ্রহভরে চমৎকার একটি মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন। অনুবাদ বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আর প্রাসঙ্গিক মতামত দিয়ে ঋদ্ধ করেছেন এ গ্রন্থকে। রাখহরি স্যারের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। বন্ধু সৈকত চৌধুরী প্রবাসের ব্যস্ত সময়ের ফাঁক দিয়ে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় এবং প্রুফ দেখায় যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। নিয়মিতভাবে প্রত্যেকটি অধ্যায় পাঠ করে ভুলত্রুটি চিহ্নিত করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মূল্যবান অভিমত জানিয়েছেন। বইটি প্রকাশের জন্য সৈকতের আগ্রহ, অনুপ্রেরণা, সহযোগিতার কোনো

তুলনা হয় না। তাঁর প্রতি আমাদের রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং অশেষ অভিবাদন। প্রুফ সংশোধনের কাজে আরো সহযোগিতা করেছেন ঘনিষ্ট বন্ধু মনির হোসাইন। তাঁর প্রতি জানাই আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা। এই বইয়ের প্রথম এবং পঞ্চম অধ্যায় বাংলা ব্লগজগতের জনপ্রিয় ওয়েব সাইট মুক্তমনা এবং বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার ছোটকাগজ *যুক্তি*তে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদ দুটি পাঠ করে অনুজপ্রতিম অভীক দাসসহ আরো অনেকেই তাদের মূল্যবাদ অভিমত জানিয়ে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। উদীয়মান তরুণ প্রকাশক রাজীব চৌধুরী আমাদের পাণ্ডুলিপিটি অত্যন্ত আগ্রহ এবং যত্নের সাথে প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। সেজন্য বিশেষ ধন্যবাদ তো তাঁকে দিতেই হয়।

বাংলাদেশে বিজ্ঞানের বই এমনিতেই কম লেখা হয়। তারপর বিদেশি বিজ্ঞানের বই অনুবাদও হয় আরো কম। এ ঘাটতি আমাদের দীর্ঘদিনের। ড. আয়ালার বইটি অনুবাদের পিছনে আমাদের তাগিদ এ কারণেই; জীববিজ্ঞানের বিশেষ করে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ভাবনা, আবিষ্কার ইত্যাদি বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে পৌছে দেয়া। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকগোষ্ঠী তৈরিতে আমাদের খুবই সামান্য প্রচেষ্টা। পরিশেষে স্বীকার করে নিচ্ছি অনেক চেষ্টার পরও হয়তো এই '*জীববিবর্তন: সাধারণ পাঠ*' নামের অনুবাদ-গ্রন্থে কোনো ধরনের ভাষাগত, বিজ্ঞানের পরিভাষাগত, তথ্যগত কিংবা অন্য কোনো ধরনের ত্রুটি থেকে যেতে পারে, তবে তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব অবশ্যই অনুবাদকদ্বয়ের। বিজ্ঞানে আগ্রহী পাঠকেরা যদি এই বই সম্পর্কে তাদের মূল্যবান মতামত, পর্যবেক্ষণ ইমেইলে (abd.jukti@gmail.com) জানান তাহলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবো।

অনন্ত বিজয় দাশ এবং সিদ্ধার্থ ধর
সিলেট।
১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

সূচি

আমরা কি বানর থেকে এসেছি?	১৯
বিবর্তন শুধুই কি একটি তত্ত্ব?	৩৩
ডিএনএ কি?	৪৪
সকল বিজ্ঞানীর কাছে কি বিবর্তন তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য?	৫৭
জীবনের সূত্রপাত হলো কিভাবে?	৭২
জীববিবর্তন ও ঈশ্বর	
কেউ কি উভয়টিতে বিশ্বাস রাখতে পারে?	৮৩
লেখক পরিচিতি	৯৫

আমরা কি বানর থেকে এসেছি?

জীবজগতে আমি (মানুষ) হচ্ছি প্রাইমেট বর্গের। বানরও হচ্ছে প্রাইমেট বর্গের। তবে আমি বা মানুষেরা কিন্তু মোটেও 'বানর' নই। জীবজগতে মানুষ যেমন প্রাইমেট বর্গের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি বানরও হচ্ছে প্রাইমেট বর্গের অন্তর্ভুক্ত। তবে মানুষ এবং বানরের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। মানুষ, বানর ছাড়াও প্রাইমেট বর্গের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এইপরা (গরিলা, ওরাঙওটাং, শিম্পাঞ্জি)। জীববিবর্তনের দৃষ্টিতে মানুষ বানর থেকে এইপদের সাথে অনেক বেশি ঘনিষ্ট আত্মীয়। বলা যায় জীবজগতে এইপরা হচ্ছে মানুষের 'প্রথম-তুতোভাই', আর বানর হচ্ছে 'দ্বিতীয় বা তৃতীয়-তুতোভাই'। আবার এইপদের মধ্যে শিম্পাঞ্জির সাথে মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ট, তারপর গরিলা এবং শেষে ওরাঙওটাং। আজ থেকে প্রায় ষাট থেকে সত্তর লক্ষ বছর আগে মানুষ ও শিম্পাঞ্জির পূর্বপুরুষের বংশধারা দুটি আরেক সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। জীববিজ্ঞানীরা এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন তিনটি পদ্ধতিতে পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমত বর্তমানকালের জীবিত প্রাইমেটদের সাথে মানুষের দৈহিক গঠনের তুলনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে, দ্বিতীয় হচ্ছে অতীতকালের প্রাইমেটদের ফসিল পরীক্ষার মাধ্যমে এবং তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে মানুষের সাথে এসব প্রাইমেটের ডিএনএ, প্রোটিন ও অন্যান্য জৈব-অণুর তুলনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। আধুনিককালে ডিএনএ ও প্রোটিন গবেষণার মাধ্যমে প্রাইমেটের বিবর্তন ধারা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ও সঠিক তথ্য-উপাত্ত জানা সম্ভব হচ্ছে এবং এখান থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় অন্যান্য প্রাইমেটের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন। পাশাপাশি আমাদের পূর্বপুরুষরা সময়ের

সাথে সাথে কিভাবে 'মানব-সদৃশ' হয়ে উঠতে থাকলো, বিবর্তনের সেই গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জানতে বিজ্ঞানীদের অবশ্যই ফসিল নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন।

চার্লস ডারউইন তাঁর '*অরিজিন অব স্পিসিজ*' গ্রন্থে মানব-বিবর্তন সম্পর্কে কিছু না বললেও ১৮৭১ সালে প্রকাশিত আরেকটি বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ '*ডিসেন্ট অব ম্যান*'-এ তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন মানুষ ও এইপরা সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এবং ওই সাধারণ পূর্বপুরুষরা মোটেও 'মানুষ' ছিল না; অর্থাৎ মানুষের চেয়ে ভিন্ন আকৃতির ছিল। ডারউইনের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে অনেক প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দিয়েছিল সমসাময়িক ধর্মীয়নেতা থেকে শুরু করে সংশয়বাদী বিজ্ঞানীরা। যেমন তাঁদের বহুল ব্যবহৃত একটি প্রশ্ন হচ্ছে এরকম–'মানুষ ও এইপের 'মধ্যবর্তী জীব' (মিসিং লিংক) কোথায় যাদের মধ্যে এইপ এবং মানুষের উভয় বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে?' ডারউইন তাঁর *ডিসেন্ট অব ম্যান* গ্রন্থে প্রাকৃতিক নির্বাচনের আলোকে মানুষের বিবর্তন ব্যাখ্যা করেছিলেন।

ষাট থেকে সত্তর লক্ষ বছর আগে শিম্পাঞ্জির বংশধারা থেকে আলাদা হয়ে মানুষের পূর্বপুরুষের যে পৃথক বংশধারা তৈরি হয়েছিল সেইসব প্রাইমেটকে জীববিজ্ঞানের ভাষায় 'হোমিনিড' বা 'হোমিনিন' বলে। ডারউইন মারা যান ১৮৮২ সালে। তাঁর মৃত্যুর সময়ও কোনো হোমিনিড ফসিল সম্পর্কে প্রত্নজীববিজ্ঞানীদের কাছে উল্লেখযোগ্য কোনো তথ্য ছিল না। যদিও ডারউইন *ডিসেন্ট অব ম্যান* গ্রন্থে অনুমান করেছিলেন এ ধরনের হোমিনিড ফসিল ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে।

প্রথম হোমিনিড আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৮৮৯ সালে। ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপ থেকে এ ফসিলটি আবিষ্কার করেন ডাচ শারীরবিদ ইয়োজিন ডিবোয়া (১৮৫৮-১৯৪০)। ফসিল হিসেবে তিনি একটি ফিমার বা উরুর হাড় এবং ছোট্ট একটি মাথার খুলি উদ্ধার করেন। ইয়োজিন ডিবোয়া সেইসময় মানুষের শারীরস্থানবিদ্যার একজন

বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ফিমার ফসিল পরীক্ষায় তিনি বুঝতে পারলেন এগুলো হাঁটতে পারে এমন দ্বিপদী ব্যক্তির হাড়গোড়। আধুনিক মানুষের ফিমারের সাথে উদ্ধারকৃত ফিমারের লক্ষণীয় মিল দেখতে পেলেন। কিন্তু ছোট্ট মাথার খুলিটির আয়তন মাত্র ৮৫০ সি.সি. (কিউবিক সেন্টিমিটার) প্রায়। সে হিসেবে খুলিটিতে মগজ বা ঘিলুর (ব্রেন) ওজন হবে কমবেশি দুই পাউন্ড। এক পাউন্ডে ৪৫৪ গ্রাম। যেখানে আমাদের মানে আধুনিক মানুষের মাথার খুলির আয়তন ১৩০০ সি.সি. ও মস্তিষ্কের ওজন তিন পাউন্ড। ডিবোয়া ফসিলটির বয়স পরীক্ষা করে দেখলেন প্রায় ১৮ লক্ষ বছরের পুরানো। মানে ওই ফসিলের ব্যক্তিটি আজ থেকে প্রায় ১৮ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে বসবাস করতো। ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে ফসিলটি পাওয়া গিয়েছে বলে ফসিল-বিজ্ঞানীরা এক সময় একে 'জাভা-মানব' বলে ডাকতেন। বর্তমানে শ্রেণীবিন্যাসবিদরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে একে 'হোমো' জিনাসের অন্তর্ভুক্ত স্বতন্ত্র আরেক প্রজাতি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক নাম দিয়েছেন *হোমো ইরেকটাস* (*Homo erectus*)। আর আমরা মানে আধুনিক মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম *হোমো সেপিয়েন্স* (*Homo sapiens*)।

ডারউইনের সময়কালের সেই 'মিসিং লিঙ্ক' এখন আর 'গোপন' নেই। জাভা দ্বীপ থেকে পাওয়া সেই প্রথম হোমিনিড ফসিল থেকে শুরু করে গত একশ বাইশ বছর ধরে ফসিল-বিজ্ঞানীরা আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে শতাধিক হোমিনিডের ফসিল আবিষ্কার করেছেন। ফসিলগুলো বিভিন্ন দেশের প্রত্নজীববিজ্ঞানী থেকে শুরু করে তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান বিশেষজ্ঞ, আণবিক জীববিজ্ঞানীরা প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করেছেন। প্রজাতি নির্ধারণ করেছেন। রেডিওমেট্রিক ডেটিংসহ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফসিলগুলোর বয়স চিহ্নিত করেছেন। আবিষ্কৃত কিছু হোমিনিড ফসিলের গঠন আবার অন্য হোমিনিড ফসিল থেকে বেশ পৃথক। ফলে এদেরকে আলাদা প্রজাতিতে স্থান দেয়া

হয়েছে। হোমিনিড ফসিল রেকর্ড থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে বাস করা হোমিনিডগুলো থেকে বর্তমান মানবকুলের (প্রজাতি) উদ্ভব পর্যন্ত সময়ের সাথে সাথে এদের মধ্যে অঙ্গসংস্থানগত অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, যেমন শরীরের আকৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে, খুলির ধারণ-ক্ষমতা ও মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ধারকৃত হোমিনিডের নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। কখনো যে স্থানে ফসিল পাওয়া গেছে সেই স্থানের নামের সাথে মিলিয়ে, কখনোবা ফসিল-আবিষ্কারকের নামের সাথে মিলিয়ে, আবার কখনোবা ফসিলটির অঙ্গসংস্থানগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য রেখে।

চিত্র ১:১ : আদি হোমিনিডরা আজ থেকে প্রায় ৭০ লক্ষ বছর আগে বাস করতো। সেখান থেকে আজকের আধুনিক মানুষ। হোমিনিডের প্রচুর ফসিল উদ্ধারের ফলে আমরা এদের বিবর্তন সম্পর্কে নিশ্চিৎ হতে পেরেছি। অনেক ফসিল থেকে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা গেছে, যা থেকে তাদের জীবন ধারণের সময়কাল ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। (দ্রষ্টব্য: Rex Dalton, "Feel it in your bones," *Nature* 440, 1100-1101, 2006.)

এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে পুরানো (ছয় থেকে সাত মিলিয়ন বছর আগের) হোমিনিড ফসিলগুলো আফ্রিকা থেকে পাওয়া গেছে। এদের নাম *সাহেল্যানথ্রোপাস* (*Sahelanthropus*) ও অরোরিন (*Orrorin*)। ফসিলগুলোর অঙ্গসংস্থানের পরীক্ষা থেকে জানা যায়, এরাই ভূমিতে দ্বিপদীদের মধ্যে সবার আগে বিচরণ শুরু করেছিল। কিন্তু তাদের মস্তিষ্ক আধুনিক মানুষের তুলনায় অনেক ছোট। আজ থেকে ৫৫ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকাতে বাস করতো *আর্ডিপিথেকাস* (*Ardipithecus*) হোমিনিডরা। *অস্ট্রেলোপিথেকাসের* প্রচুর ফসিল পাওয়া গেছে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে। প্রায় ৪০ লক্ষ বছর আগে *অস্ট্রেলোপিথেকাস*রা আফ্রিকাতে বাস করতো। এরা যদিও আধুনিক মানুষের মত সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো কিন্তু তাদের করোটির ধারণ-ক্ষমতা ছিল প্রায় এক পাউন্ড। অর্থাৎ এটি গরিলা ও শিম্পাঞ্জির করোটির আয়তনের প্রায় সমান এবং আধুনিক মানুষের করোটির তুলনায় মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ। *অস্ট্রেলোপিথেকাস*দের খুলিতে একই সাথে এইপ এবং আধুনিক মানুষের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন নিচু কপাল, এইপ-সদৃশ মুখমণ্ডল, আবার তাদের দাঁতের সাথে আধুনিক মানুষের দাঁতের অবস্থানের আনুপাতিক সাদৃশ্য ছিল। *অস্ট্রেলোপিথেকাসের* কাছাকাছি সময়কালে অন্যান্য হোমিনিডের মধ্যে নাম উল্লেখ করা যায় *কেনিয়ানথ্রোপাস* (*Kenyanthropus*) ও *প্যারানথ্রোপাস* (*Paranthropus*) হোমিনিডের নাম। এই উভয় হোমিনিডের মস্তিষ্কের আকার তুলনামূলকভাবে ছোট ছিল, যদিও *প্যারানথ্রোপাসের* কিছু প্রজাতির দীর্ঘ আকৃতির শরীর ছিল। *প্যারানথ্রোপাস* হোমিনিডকুলের এক পার্শ্বশাখা হিসেবে প্রকাশ করে, যারা পরবর্তীতে অন্যান্য হোমিনিডদের মতোই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আমাদের হোমো জিনাসের অন্তর্ভুক্ত আদি প্রজাতি হচ্ছে *Homo habilis*। *হোমো হেবিলিসের* ফসিল ও ফসিলের উদ্ধারকৃত স্থানের আশপাশের আলামত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন এরাই প্রথম হোমোনিড যারা পাথরে তৈরি খুব সাধারণ

হাতিয়ার ও ব্যবহার্য বস্তু তৈরি করতে পারতো। এদেরকে '*habilis*' নাম দেয়ার কারণও তাই। '*habilis*' শব্দটি ল্যাটিন ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ যে ব্যক্তি হাতের কাজে দক্ষ। *হোমো হেবিলিসের* মাথার খুলির আয়তন ৬০০ সি.সি., যা পূর্বের সব হোমিনিড থেকে বেশি কিন্তু আধুনিক মানুষের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। আজ থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ বছর আগে *হোমো হেবিলিসরা* আফ্রিকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকায় বসবাস করতো। *হোমো হেবিলিসের* মধ্যেই আমরা প্রথম সামান্য পরিমাণে হলেও প্রযুক্তি ব্যবহারের সূচনা দেখতে পাই।

হোমো হেবিলিসের পরবর্তী উত্তরসূরি হচ্ছে *হোমো ইরেকটাস*। আজ থেকে প্রায় ১৮ লক্ষ বছর আগে বিবর্তনের মাধ্যমে *হোমো ইরেকটাসের* আফ্রিকাতেই উদ্ভব ঘটে। *হোমো ইরেকটাসদের* মস্তিষ্কের আয়তন ৮০০ থেকে ১১০০ সি.সি. (২ থেকে ২.৫ পাউন্ড)। *হোমো ইরেকটাসরা হোমো হেবিলিস* থেকে আরেকটু উন্নতমানের হাতিয়ার এবং ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারতো। *হোমো ইরেকটাস* প্রজাতির দুটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই লক্ষণীয়। প্রথমটি হচ্ছে, এই প্রজাতিটির দীর্ঘ সময় ধরে (১৮ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ বছরের কাছাকাছি) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করার পরও তাদের মধ্যে সামান্য পরিমাণ অঙ্গসংস্থানগত পরিবর্তন ঘটেছে। এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে এরা প্রথম হোমিনিড প্রজাতি যারা প্রথম আফ্রিকা মহাদেশ ছেড়ে অন্য মহাদেশে (ইউরোপ ও এশিয়া) পাড়ি দিয়েছিল। আফ্রিকাতে উদ্ভবের পর কিছু সময় পর *হোমো ইরেকটাসের* বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠী (১৬ থেকে ১৮ লক্ষ বছর আগে) ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ, এশিয়াতে এবং খুব সম্ভবত আড়াই লক্ষ বছর পর্যন্ত তারা সেখানে বসবাস করেছিল। এমন কী চীনের উত্তরাঞ্চল ও ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত এরা পৌঁছে গিয়েছিল। ডাচ বিজ্ঞানী ইয়োজিন ডিবোয়া ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপ থেকে *হোমো ইরেকটাসের* প্রথম ফসিল আবিষ্কার করেন।

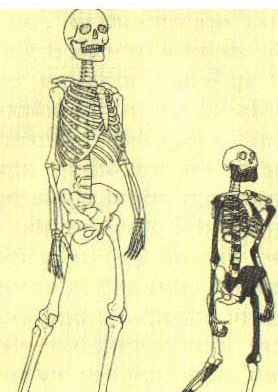

চিত্র ১:২ আধুনিক মানুষের কঙ্কালের সাথে প্রায় ৩৫ লক্ষ বছর পুরাতন 'লুসি'র (*Australopithecus afarensis*) ফসিলের তুলামূলক চিত্র। আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ লুসি দ্বিপদী হলেও এর ছিল খর্বাকৃতি দেহ ও ছোট মস্তিষ্ক। ১৯৭২ সালে ইথিওপিয়া থেকে লুসির কঙ্কালতন্ত্রের ৪০ ভাগ উদ্ধার করা হয়েছে। উপরের চিত্রে তা কালো দাগ দিয়ে বুঝানো হয়েছে।

হোমো ইরেকটাসের পর বিবর্তনের মাধ্যমে আরো দুটো হোমিনিড প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে ঘটেছে, যেমন *হোমো নিয়্যানডার্টালেনসিস* (*Homo neanderthalensis*) এবং মানুষের প্রজাতি *হোমো সেপিয়েন্স*। *নিয়্যানডার্টাল*দের অনেকগুলো ফসিল আবিষ্কার হয়েছে ইউরোপ থেকে। এসব ফসিল বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এদের প্রথম উদ্ভব ঘটে আজ থেকে দুই লক্ষ

বছর আগে এবং এদের বিলুপ্তি ঘটেছে মাত্র ত্রিশ হাজার বছর আগে। সর্বশেষ *নিয়্যানডার্টাল* প্রজাতির ফসিল পাওয়া গেছে স্পেন থেকে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এখানেই তাদের শেষ বাসস্থান ছিল। *নিয়্যানডার্টাল*দের মস্তিষ্ক বড় ছিল, অনেকটা আমাদের মত এবং শরীরও আমাদের মতই তবে কিছুটা বেটে ও মোটাসোটা।

খুব সম্ভবত চার লক্ষ বছর আগে আফ্রিকায় *হোমো ইরেকটাস* থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে *হোমো সেপিয়েন্স* প্রজাতির উদ্ভব হয়েছিল। যখন বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে *ইরেকটাসের* ফসিল উদ্ধার হতে লাগলো তখন অবশ্য ধারণা করা হতো এই হোমিনিডরা হয়তো *হোমো সেপিয়েন্স* প্রজাতিরই কোনো একটা 'আদিম রূপ'। আধুনিক মানুষেরও উদ্ভব হয়েছিল আফ্রিকাতে দুই থেকে দেড় লক্ষ বছর আগে। এবং শেষমেশ *হোমো সেপিয়েন্স*ই সমগ্র পৃথিবীতে বসতি স্থাপন করে অন্য হোমিনিডদের জায়গা দখল করে নেয়। হোমিনিড বিবর্তন-গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা মনে করেন *হোমো ইরেকটাসের* যেসব সদস্য সর্বপ্রথম এশিয়া ও ইউরোপে বসতি স্থাপন করেছিল তারা সেখানে কোনো সরাসরি উত্তরসূরি (নতুন প্রজাতি) রেখে যায়নি। তবে এই ধারণার বাইরেও নতুন আরেকটি মত প্রচলিত রয়েছে। ২০০৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার ফ্লোরস দ্বীপ থেকে পাওয়া নতুন প্রজাতির (*Homo florensiensis*) হোমিনিড ফসিল গবেষণা করে জানা গেছে এরা সেখানে আজ থেকে ১২ থেকে ১৮ হাজার বছর বাস করতো। ধারণা করা হচ্ছে *হোমো ফ্লোরেনসিয়েনসিস* প্রজাতি সম্ভবত এশিয়ায় বসতিস্থাপনকারী *হোমো ইরেকটাসেরই* উত্তরসূরি। যদিও এ বিষয়টি নিয়ে এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। গবেষণা অব্যাহত রয়েছে।

পৃথিবীর মহাদেশগুলোতে আধুনিক *হোমো সেপিয়েন্স*দের বসতি স্থাপন তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক ঘটনা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনে বসতি স্থাপন হয়েছে আজ থেকে মাত্র ৬০ হাজার বছর আগে, অস্ট্রেলিয়াতে এর কিছু পরেই। ইউরোপে *হোমো সেপিয়েন্স*দের

আগমন মাত্র ৩৫ হাজার বছর আগে। আমেরিকাতেও ১৫ হাজার বছর আগে সাইবেরিয়া থেকে এসে *হোমো সেপিয়েন্সরা* বসতি স্থাপন করে। আধুনিক মানুষদের মধ্যেকার নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য খুব বেশিকাল আগে সূচিত হয়নি। কারণ *হোমো সেপিয়েন্স* জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা শুরু হয়েছে মাত্র ষাট হাজার বছর আগে।

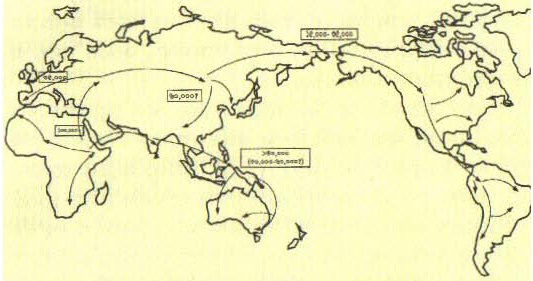

চিত্র ১:৩ আফ্রিকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকা থেকে *হোমো সেপিয়েন্স* প্রজাতির উপনিবেশ স্থাপনের ছিত্র। আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট হাজার বছর পূর্বে *হোমো সেপিয়েন্সরা* উত্তর ও দক্ষিণ এশিয়াতে পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। তবে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে গিয়েছিল মাত্র পয়ত্রিশ হাজার বছর আগে। এটা একটা ধাঁধা! ইউরোপে পৌছাতে কেন এতো দেরি হল? একটা ব্যাখ্যা হচ্ছে এরকম ইউরোপে প্রায় দুই লক্ষ বছর পূর্ব থেকেই *নিয়ানডার্টালরা* বসতি গেড়ে ছিল। ত্রিশ হাজার বছর আগে *নিয়ানডার্টালদের* বিলুপ্তির আগ পর্যন্ত হোমো সেপিয়েন্সরা ইউরোপের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেনি।

গত শতাব্দীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জীববৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যক্রম 'মানব জিনোম প্রকল্প' শুরু হয় আমেরিকাতে ১৯৮৯ সালে। এই প্রকল্পের অর্থায়নে ছিল আমেরিকার 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ' ও 'ডিপার্টমেন্ট অব এনার্জি'। সরকারি উদ্যোগে মানব জিনোম প্রকল্প শুরু হওয়ার কিছু সময় পর 'সিলেরা জিনোমিক্স' নামের আমেরিকার বেসরকারি একটি জিনোম গবেষণা প্রতিষ্ঠানও

স্বাধীনভাবে একই ধরনের গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে। তারাও সরকারি অনুদান সংগ্রহ করে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে স্বতন্ত্রভাবে শুরু হওয়া এই গবেষণা কার্যক্রমের লক্ষ্য ঠিক করা হয় আগামী ১৫ বছরের মধ্যে মানব-জিনোমের সম্পূর্ণ অনুক্রম উদ্ঘাটন করা। এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় ধরা হয় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ কাকতালীয়ভাবে প্রতিটি ডিএনএ বর্ণের (A, T, C, G) জন্য ১ ডলার বাজেট বরাদ্দ করা হয়। ২০০১ সালে মানব জিনোম অনুক্রমের একটি খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করেন বিজ্ঞানীরা। ২০০৩ সালে এ প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

মানব-জিনোমের ডিএনএ অনুক্রম বিশ্লেষণ করা প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে আমাদের জন্য একটি বিশাল অর্জন। আমাদের জিনোমে তিন বিলিয়ন নিউক্লিওটাইডের (A, T, C, G) ডিএনএ অনুক্রম রয়েছে। এগুলি যদি ছাপানো যায় তবে এর পরিমাণ হবে প্রতি বইয়ে ১০০০ পৃষ্ঠা রয়েছে এমন এক হাজার ভলিউমের সমান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য উন্নতির ফলে এই ধরনের জটিল গবেষণা কার্যক্রমের সফল সমাপ্তি সম্ভব হয়েছে। গত কয়েক বছরে জীববিজ্ঞানে প্রযুক্তিগত এতই উন্নতি সাধিত হয়েছে যে পরবর্তীতে আরও কয়েকজন ব্যক্তিরও জিনোম অনুক্রম বিশ্লেষণ করা হয়েছে আর এতে প্রতিবারে ব্যয় হয়েছে এক লক্ষ মার্কিন ডলার (তিন বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন পড়েনি) করে এবং সময় লেগেছে মাত্র এক মাস (চৌদ্দ বছরও প্রয়োজন হয় নি)।

মানুষ ছাড়াও আরো কিছু প্রজাতির জিনোম অনুক্রম বিশ্লেষণ করা হয়েছে ইতোমধ্যে। বিশেষ করে শিম্পাঞ্জির (*Pan troglodytes*) জিনোম অনুক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর। মানুষের সাথে শিম্পাঞ্জির জিনোম অনুক্রমের তুলনামূলক বিশ্লেষণও করা হয়েছে। জিনেটিক লেভেলে মানুষের স্বতন্ত্র অবস্থান কোথায়, কোন জিনগত বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষের বাহ্যিক (ফিনোটাইপ) পরিবর্তন ঘটেছে তা বোঝার জন্য এই ধরনের

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মানুষ ও শিম্পাঞ্জির তুলনামূলক জিনোম অনুক্রমের ফলাফলও সমপরিমাণ চমকপ্রদ। দেখা গেছে মানুষ ও শিম্পাঞ্জির জিনোম অনুক্রম প্রায় ৯৯% হুবহু একই রকম। পার্থক্য মাত্র ১ ভাগে। তবে এই পার্থক্য কারো কাছে খুব কম মনে হতে পারে আবার কারো কাছে অনেক বড় মনে হতে পারে। বিষয় হচ্ছে–কে কিভাবে বিষয়টি দেখবে। বলা হচ্ছে মানুষের এই ৩ বিলিয়ন ডিএনএ অক্ষরের মধ্যে শতকরা ১ ভাগ পার্থক্য রয়েছে শিম্পাঞ্জির সাথে। এর অর্থ দাঁড়ায় ৩০ মিলিয়ন ডিএনএ অক্ষরে পার্থক্য রয়েছে শিম্পাঞ্জির সাথে।

মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির উভয় প্রজাতিতে শতকরা ২৯ ভাগ এনজাইম এবং অন্যান্য প্রোটিন একই রকমের জিন দ্বারা গঠিত। একশত থেকে কয়েকশত অ্যামিনো অ্যাসিডের মাধ্যমে জীবদেহের প্রতিটি প্রোটিন গঠিত। এর মধ্যে শতকরা ৭১ ভাগ 'অসমরূপ' প্রোটিনে পার্থক্য রয়েছে মানুষ ও শিম্পাঞ্জির মধ্যে। আর এই পার্থক্য সূচিত হয়েছে গড়ে মাত্র দুটি অ্যামিনো অ্যাসিডের কারণে। এখন কেউ যদি হিসেব করতে চায় এইভাবে ডিএনএ খণ্ডকগুলো একটি প্রজাতিতে পাওয়া গেল কিন্তু অন্যটিতে পাওয়া যায়নি তাহলে বলতে হবে উভয় প্রজাতিতে ডিএনএ অনুক্রমে শতকরা ৯৬ ভাগে হুবহু মিল রয়েছে। এক্ষেত্রে উভয় প্রজাতির মধ্যে ৯৯% একই রকমের ডিএনএ অনুক্রমে মিল নয়। আর জিনেটিক উপাদান প্রায় শতকরা তিন ভাগ পার্থক্য মানে ৯০ মিলিয়ন ডিএনএ অক্ষরে এই পার্থক্য রয়েছে। গত ছয় থেকে সাত মিলিয়ন বছর পূর্বে সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির বিবর্তনক্রম আলাদাভাবে শুরু হওয়ার পর উভয় প্রজাতির জিনোমে ডিএনএ 'অক্ষরগুলো' একের পর এক সন্নিবেশিত হয়েছে অথবা বিলুপ্তি ঘটেছে। অবশ্য এদের মধ্যে অনেক ডিএনএ রয়েছে যারা প্রোটিন তৈরি জন্য জিন ধারণ করে না। তাই এদেরকে 'জাংক ডিএনএ' বলে।

দুই প্রজাতির জিনোম অনুক্রমের তুলনা থেকে সুনির্দিষ্ট জিনগুলির বিবর্তনীয় হার খুব সহজে বোঝা যায়। একটা গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে যে-সব জিন আমাদের মস্তিষ্কে সক্রিয় বা ক্রিয়াশীল রয়েছে, শিম্পাঞ্জিকুলের তুলনায় সেগুলির বেশি পরিবর্তন ঘটেছে মানবকুলে। মোটের উপর ৫৮৫টি জিন, এর মধ্যে কিছু জিন যেমন ম্যালেরিয়া এবং যক্ষা রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। এদের বিবর্তন খুব দ্রুত হয়েছে মানবকুলে। (এটা স্মরণযোগ্য শিম্পাঞ্জির তুলনায় মানুষের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ অত্যন্ত তীব্র।) মানব-জিনোমের অনেক জায়গায় দেখা গেছে, গত আড়াই লক্ষ বছরে মানবকুলের জন্য উপকারী জিনগুলির দ্রুত বিবর্তন ঘটেছে। যেমন ভাষার উদ্ভবের পিছনে যে ফক্সপি২ (*FOXP2*) জিনের ভূমিকা রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন, এর বিবর্তন ঘটেছে দ্রুতগতিতে আমাদের প্রজাতিতে।

জীবজগতে মানুষের স্বতন্ত্র অবস্থান সম্পর্কে বর্তমানে আমরা কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা জানি, যেমন বড় মস্তিষ্ক এবং কিছু জিনের দ্রুতগতির বিবর্তনীয় হার (এর মধ্যে ভাষার উদ্ভবের জিন জড়িত রয়েছে)। এই জ্ঞান আমাদের জন্য খুব আকর্ষণীয় মনে হলেও কোন কোন জিনগত পরিবর্তন আমাদের পুরোদস্তুর মানুষ বানিয়েছে সে-সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের এখনও ক্ষীণ।

মানুষ ও শিম্পাঞ্জি জিনোম নিয়ে আগামী দুই-এক দশকের মধ্যে হয়তো আরো বর্ধিত গবেষণার মাধ্যমে জানতে পারবো কিভাবে আমরা 'স্বতন্ত্র' মানুষ হলাম। যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের 'মানুষ' বানিয়েছে তার যাত্রা শুরু হয় আমাদের ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে ভ্রূণাবস্থাতেই। এবং বংশগতিতে নিহিত তথ্যাবলি সময়ের সাথে সাথে ব্যক্তির বেড়ে উঠার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, মানুষের যে সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলি রয়েছে তার বিকাশ ঘটে মস্তিষ্কে এবং ভূমিকা রাখে ব্যক্তির চিন্তায় ও মানবীয় পরিচয়ে।

অন্যান্য প্রাইমেট থেকে মানুষের স্বতন্ত্র অবস্থান বুঝতে হলে খেয়াল রাখতে হবে মানুষের মস্তিষ্কের অসামান্য অগ্রগতি, উন্মোচিত হয়েছে নতুন ধরনের বিবর্তন, যা ছাড়িয়ে গেছে জীববিবর্তনের সব সীমাকে। প্রযুক্তির সাহায্যে পরিবেশকে নিজ উদ্দেশ্যে সুনিপুণভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অভিযোজন ঘটেছে মানুষের। প্রকৃতিতে জীবসমূহের প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পরিবেশের সাথে অভিযোজন ঘটে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জিনেটিক গঠনের পরিবর্তন ঘটে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে। কিন্তু মানুষ (যে কোনো দিক দিয়েই স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থান করছে) তার নিজেদের চাহিদানুযায়ী পরিবেশকে পরিবর্তনের, নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন করেছে বিপুলভাবে। আগুনের ব্যবহার, পোষাকের ব্যবহার, নিজস্ব বাসস্থান ইত্যাদি মানুষকে পুরাতন পৃথিবীর উষ্ণ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকা থেকে ছড়িয়ে পড়তে সহায়তা করেছে, জৈবিকভাবে গোটা পৃথিবীতে অভিযোজনে ভূমিকা রেখেছে, শুধু তীব্র শীতপ্রধান এলাকা অ্যান্টার্টিকা বাদে। জিনগত পরিবর্তনের ফলে তীব্র ঠাণ্ডা আবহাওয়া থেকে রক্ষার জন্য মানুষের শারীরিক সক্ষমতা তৈরি হবে (যেমন চুল এবং লোম বৃদ্ধি পাবে) এমন সময় পর্যন্ত আর অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই। ফুলকা বা পাখা গঠনের জন্যও কোনো বাধাধরা নিয়ম নেই, আমরা প্রযুক্তির উন্নতির ফলে জাহাজ বা বিমানে করে এমনিতেই সাগরে কিংবা আকাশে পাড়ি দিতে পারি অনায়সে। এটা মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশের (কিংবা মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতার) ফলে মানবজাতি আজকে এত সফল, সকল জীবিত প্রজাতির থেকে অর্থবহ অবস্থানে রয়েছে।

গত দুই দশকে জীববিজ্ঞানের আরেক শাখা 'নিউরোবায়োলজি'তে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। অসামান্য সব আবিষ্কার ঘটেছে এখানে। আলো, তাপ, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো কিভাবে ট্রিগারের ভূমিকা পালন করে, স্নায়ুর মাধ্যমে তথ্য পাঠিয়ে দেয় মস্তিষ্কে এবং সেখান থেকে সারা

শরীরে তা খুব ভালোভাবে জানা গেছে। এমন কী এও জানা গেছে শরীরের ভিতরে নিউরাল চ্যানেলগুলো কিভাবে তথ্য প্রেরণ করে শারীরিক কাজকর্মে ভূমিকা রাখার জন্য অথবা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পর পুনর্গঠনের জন্য অথবা কোন নিউরন বা নিউরনগুচ্ছ শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গগুলোতে তথ্য গ্রহণ-প্রেরণ করে থাকে। এরপরও বলতে হয়, এত উন্নতির পরও স্নায়ুজীববিজ্ঞান এখনও গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমে শৈশবকালীন পর্যায়ে রয়েছে। গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেলের সূত্রাবলি যখন পুনর্আবিষ্কারের সময় জিনেটিক্সের যে অবস্থা ছিল বিংশ শতাব্দীতে। অনেকটা সেরকমই স্নায়ুজীববিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয় এখনো অজানা যেমন একজন ব্যক্তির জীবনে শারীরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা ঘটনাবলি কিভাবে মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, আমাদের চেতনায় সচেতনতার উদ্ভব কিভাবে ঘটে এবং কিভাবে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটে চিন্তার ক্ষেত্রে ইত্যাদি।

আমি মনে করি না চিন্তাজগতের এই রহস্যময়তা দীর্ঘদিন অনুদ্‌ঘাটিত থাকবে। বরং এই ধাঁধার উত্তর মানবজাতি তার দার্শনিক বিশ্লেষণ আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই উদ্ঘাটন করতে পারবে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি আগামী অর্ধশতাব্দীর ভিতরে এই ধরনের প্রচুর সংখ্যক ধাঁধার সমাধান হয়ে যাবে। তখন আমরা আরও বেশি 'নিজেকে জানা'র মধ্য দিয়ে ভালো থাকবো এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাবো।

'জীববিবর্তন' কি শুধুই একটি তত্ত্ব মাত্র? পরের অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোচনায় যাচ্ছি, বিবর্তন আসলেই একটি তত্ত্ব, তবে সেটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে। কোনো ধরনের অনুমাননির্ভর বা ব্যক্তিগত মতামতের প্রেক্ষিতে নয় এটি। বরং জীববিবর্তনের পক্ষে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, হাজারও পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ফলাফল। তাই বিবর্তন অবশ্যই জীবজগতের একটি বাস্তবতা এবং সাথে সাথে এটি একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও।

বিবর্তন শুধুই কি একটি তত্ত্ব?

বিবর্তন একটি তত্ত্ব এবং একই সাথে অবশ্যই বাস্তব ঘটনা। এখানে একই সাথে 'দুটো দাবি' করা হয়েছে অনেকের কাছে তা আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে। তাই বিষয়টি ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। তাহলে চলুন প্রথমে দেখে নেয়া যাক কেন বিবর্তন একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং পরে আমরা দেখবো বিবর্তন কিভাবে জীবজগতের বাস্তব ঘটনা।

যখন বিজ্ঞানীরা বিবর্তন 'তত্ত্ব' নিয়ে কথা বলেন তখন সাধারণ মানুষ প্রত্যহ 'তত্ত্ব' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করে তার থেকে কিছুটা ভিন্ন অর্থে বুঝিয়ে থাকেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 'তত্ত্ব' শব্দটি প্রচুর ব্যবহার করি, কোনো কিছু 'অনুমান' করাকে বোঝাতে, কিংবা কোনো ধরনের 'ধারণা' বা ব্যক্তিগত 'বিশ্বাস' বুঝাতেও এই শব্দটি ব্যবহার হয়। যেমন কেউ হয়তো বলতে পারেন আমার তত্ত্ব অনুযায়ী ওসামা বিন লাদেন আসলে লুকিয়ে আছেন। আবার কেউ হয়তো বলতে পারেন আমার তত্ত্ব হচ্ছে শহরে বাস করা নাগরিকের তুলনায় শহরের উপকণ্ঠে বাস করা লোকেরা শারীরিকভাবে মোটাসোটা হয়। অন্য কেউ এই বক্তব্যের জবাবে বলতে পারেন, এটা তোমার নিছক একটা তত্ত্ব মাত্র, আর কিছু না। কোনো প্রমাণ নেই এই বিষয়ের। কিন্তু বিজ্ঞানে যখন 'তত্ত্ব' শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সুনির্দিষ্ট এবং পর্যাপ্ত ব্যাখ্যাকে বোঝায় যার সাথে সম্পৃক্ত থাকে পর্যবেক্ষণ, বাস্তবতা, প্রাকৃতিক নিয়ম, অনুমান এবং পরীক্ষিত অনুকল্প। অবশ্য বিজ্ঞানীরাও 'তত্ত্ব' শব্দটিকে মাঝে মাঝে অসতর্কভাবে ব্যবহার করে ফেলেন কোনো বিষয়ের আপাত ব্যাখ্যার জন্য। হয়তো এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রমাণের অভাব থাকতে পারে। আসলে এই 'আপাত ব্যাখ্যা' শব্দদ্বয়কে বোঝানোর জন্য

সঠিক পরিভাষাটি হচ্ছে 'অনুকল্প' (হাইপোথিসিস)। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না 'তত্ত্ব' শব্দের সাদামাটা ব্যবহার আর যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণ-সম্বলিত কোনো বিষয়কে বোঝাতে 'তত্ত্ব' শব্দের ব্যবহারের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকা উচিৎ। যেমন জীববিবর্তন তত্ত্ব, যার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

বিজ্ঞানের জগতে 'জীববিবর্তন' ছাড়াও অন্য অনেক শক্তিশালী তত্ত্ব রয়েছে। সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবী সূর্যের চারপাশে পরিভ্রমণ করছে। 'পরমাণু তত্ত্ব' অনুযায়ী সকল বস্তুই পরমাণু দ্বারা গঠিত হয়েছে। কোষতত্ত্ব বলে, সকল জীবিত প্রাণী কোষ দ্বারা গঠিত। জীববিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী সকল জীব ক্রমবিকাশের মাধ্যমে একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যে-সব প্রজাতির অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি সময়ে সাধারণ পূর্বপুরুষ রয়েছে তাদের মধ্যে পরস্পর জিনগত মিল অনেক বেশি। যেমন মানুষ ও শিম্পাঞ্জি। এদের মধ্যে পরস্পরের জিনগত মিল অনেক বেশি। এ তুলনায় বেবুন, হাতি কিংবা ক্যাঙ্গারু তাদের দূরের আত্মীয় অর্থাৎ জিনগত মিলের পরিমাণ কম। জীবজগতে প্রজাতির প্রাচুর্য রয়েছে। জীবেরা সবাই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবেশ ভেদে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথক পৃথক জীবকুলের উদ্ভব ঘটেছে।

সাধারণ পরিসরের তুলনায় বিজ্ঞানে যেমন তত্ত্ব শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি 'ফ্যাক্ট' শব্দটিও ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। একটা বৈজ্ঞানিক 'ফ্যাক্ট' হচ্ছে এমন একটা ঘটনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত যা বারবার পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এবং কোনো ধরনের যৌক্তিক সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকে না। যেমন আমরা দৈনন্দিন জীবনে খাবারের সাথে যে লবন খাই তা সোডিয়াম ও ক্লোরিনের মিশ্রণে তৈরি। কিংবা ডিএনএ চারটি নিউক্লিওটাইডের মিশ্রণে তৈরি : A, T, C, G। এগুলো হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ফ্যাক্ট। আবার সচরাচর ব্যবহৃত অর্থে 'ফ্যাক্ট' শব্দ ভিন্ন কিছু বোঝাতে পারে। যেমন কারো

চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ অথবা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বোঝাতে 'ফ্যাক্ট' শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে, যার সাথে পুনঃপুনঃ পরীক্ষালব্দ প্রমাণের সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।

জীবজগতের উদ্ভিদ-প্রাণীর বিবর্তনীয় উদ্ভব নিয়ে বিজ্ঞানীদের কাছে এতো বেশি প্রমাণ রয়েছে যে এ নিয়ে আর কোনো সন্দেহ বা সংশয় নেই। পৃথিবী যেমন সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করেছে এ বিষয়ে আমাদের কাছে ভূরিভূরি প্রমাণ রয়েছে কিংবা প্রমাণের আধিক্যের কারণে বস্তুর পারমাণবিক গঠন নিয়ে কোনো সংশয় নেই, ঠিক তেমনি জীবজগতে বিবর্তন যে ক্রিয়াশীল তার প্রমাণের আধিক্যের কারণে এটি এখন সন্দেহের ঊর্ধ্বে। তাই সাধারণ ভাষায় বলা যায়, বিবর্তন কেবল নিছক একটি তত্ত্বই নয় এটি একটি বৈজ্ঞানিক ফ্যাক্ট।

এ বক্তব্যে কারো কারো মধ্যে হয়তো আপত্তি দেখা দিতে পারে। কোনো ব্যক্তি যেহেতু প্রজাতির বিবর্তন নিজের চোখে দেখতে পান নাই তাহলে কিভাবে এতো নিশ্চয়তার সাথে দাবি করা যেতে পারে বিবর্তন আসলেই বাস্তব ঘটনা? উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মানুষ ও শিম্পাঞ্জি একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে এটা কোনো পরীক্ষাগারে প্রতিলিপি তৈরি করে সরাসরি দেখানো হয়নি। তাহলে কি এটা সত্য নয় বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও প্রতিলিপিকরণের উপর নির্ভরশীল? হ্যাঁ, অবশ্যই এ বক্তব্যগুলো সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যা পর্যবেক্ষণ কিংবা পরীক্ষণ করেন তাই কিন্তু কোনো তত্ত্ব গঠনের একমাত্র সাধারণ উপসংহার নয় বরং কোনো বিষয়ের উপর পরিচালিত বিভিন্নমুখী পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ থেকে বিজ্ঞানীরা একটি সাধারণ উপসংহারে পৌছান।

সেই ষোল শতকের দিকে কোপারনিকাস যখন তাঁর সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বে জানালেন পৃথিবী স্থির নয়, সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, তখন বিজ্ঞানীরা শীঘ্রই এই বক্তব্যকে গ্রহণ করলেন কারণ তাদের কাছে প্রচুর নিশ্চিত হওয়ার মতো প্রমাণ ছিল। কিন্তু তখনও কেউ

মহাকাশে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসেনি পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। এমন কী এখনও পর্যন্ত কোনো নভোচারী সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর বাৎসরিক পরিভ্রমণ অবলোকন করতে পারেন নাই। আমরা সকলেই জানি পরমাণুর বৈচিত্র্যেই এই বস্তুজগৎ গঠিত হয়েছে কিন্তু কেউই যদি পরমাণুকে স্বচক্ষে না দেখতো কখনো, তবু এর অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার কিছু থাকতো না। কারণ পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নবিজ্ঞানের অন্য সব পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে পরমাণু আসলেই অস্তিত্বশীল। সাম্প্রতিক সময়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করা গেছে যার দ্বারা অনেক অনেক বর্ধিত আকারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকে দেখা যায়। এর মাধ্যমে বস্তুর মধ্যেকার পরমাণু ও অণুর উপস্থিতির চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়েছে তবে এদের উপস্থিতির অস্তিত্ব নিয়ে অনেক আগেই নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরমাণু তত্ত্ব অনুযায়ী পরমাণুর মধ্যেকার প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রনসহ অন্যান্য কণিকা সম্পর্কে যেসব তথ্য জানা গেছে তা হয়তো সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যতে হয়তো পরমাণু এবং তার মধ্যেকার গঠন-উপাদান সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন তবে পরমাণু তত্ত্বও শুধুমাত্র চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল নয়। পরমাণুর 'চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণে'র ফলে পরমাণু তত্ত্বে আসলে নতুন তেমন কিছু বক্তব্য যুক্ত হয় না, বরং এটা শুধু জানা যায় পরমাণুর অস্তিত্ব রয়েছে।

জীববিবর্তন তত্ত্বও তেমনি অসংখ্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে 'তত্ত্ব' হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যেমন জীববিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী বেবুন জাতীয় প্রাণীর তুলনায় মানুষ ও শিম্পাঞ্জির মধ্যে বিবর্তনগত সম্পর্ক অধিক ঘনিষ্ঠ। আর এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে মানুষ, শিম্পাঞ্জি ও বেবুনের ডিএনএ'র তুলনামূলক পরীক্ষা থেকে। মানুষ ও শিম্পাঞ্জির ডিএনএ'র গঠনগত মিল অনেক বেশি, শিম্পাঞ্জি ও বেবুনের ডিএনএ'র তুলনায়। মানুষ ও শিম্পাঞ্জি'র জিনগত আত্মীয়তার বিষয়টি পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানীরা প্রথমে এই প্রজাতিদ্বয়

থেকে একটি বিশেষ 'জিন' সংগ্রহ করে এর ডিএনএ-গঠন পরীক্ষা করেন। এ পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষ-শিম্পাঞ্জির বিবর্তন সংক্রান্ত পূর্বানুমানের সঠিকতা প্রমাণিত হয়। জিন পরীক্ষা করা ছাড়াও আরো বহুবিধ পরীক্ষা-প্রমাণ থেকে জীববিবর্তন বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

জীববিবর্তন তত্ত্ব মূলত তিনটি ভিন্ন বক্তব্যকে প্রকাশ করে। যদিও এসব বক্তব্য পরস্পর সম্পর্কিত। প্রথমটি হচ্ছে : (১) বিবর্তনের বাস্তবতা। অর্থাৎ প্রতিটি জীব একই পূর্বপুরুষের মাধ্যমে পরস্পর সম্পর্কিত। (২) জীবজগতে বিবর্তনীয় ইতিহাস রয়েছে। জীবের বংশানুক্রমগুলো একে অপর থেকে আলাদা হয়েছে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে এবং যেখানে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেখানে নতুন বংশক্রমের উদ্ভব ঘটেছে। (৩) জীবজগতে বিবর্তনের প্রক্রিয়া রয়েছে, যার মাধ্যমে বিবর্তন ক্রিয়াশীল থাকে।

উল্লেখিত প্রথম বিষয়টি বিবর্তন তত্ত্বের অত্যন্ত মৌলিক এবং ইতোমধ্যে এই বিষয়টি সর্বোচ্চ নিশ্চয়তার সাথে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। ডারউইন নিজেও এ বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে প্রমাণ যোগাড় করেছিলেন এবং পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে জীববিজ্ঞানের সবগুলো শাখা থেকে এ সম্পর্কিত প্রমাণ যোগাড় করা সম্ভব হয়েছে। জীবের বিবর্তনীয় উদ্ভব নিয়ে আজকের যুগে জীববিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক উপসংহারে পৌঁছেছেন যা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমনটি পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান কিংবা আণবিক জীববিজ্ঞানের অনেক বিষয়েও বিজ্ঞানীরা এই রকম নিশ্চয়তার সাথে উপসংহারে পৌঁছাতে পেরেছেন। বিজ্ঞানীদের এই সন্দেহহীনতার কারণেই তারা বিবর্তনকে একটি 'ফ্যাক্ট' বলে থাকেন। প্রায় সব জীববিজ্ঞানীই জীবের বিবর্তনীয় উদ্ভবকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

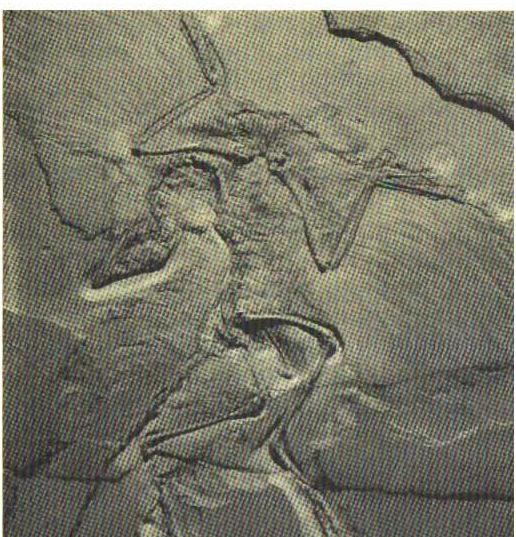

চিত্র ২:১ উপরের ছবিটি জার্মানির ব্যাভারিয়ার চুনাপাথরের খনি থেকে আবিষ্কৃত ১৫ কোটি বছর পুরাতন আর্কিওপ্টেরিক্সের ফসিল। ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জি অনুসারে এটি জুরাসিক যুগের শেষের দিককার। বাস করতো মধ্য ইউরোপে। ব্যাভারিয়া অঞ্চলের সলেনহোফেন চুনাপাথরের খনি থেকে বেশ কয়েকটি আর্কিওপ্টেরিক্সের ফসিল উদ্ধার করা গেছে। প্রথম পাওয়া গিয়েছিল ১৮৬০ সালে এবং সর্বশেষ পাওয়া গেছে ২০০৫ সালে। আর্কিওপ্টেরিক্স কাকের সমান ছোট্ট প্রাণী। আর্কিওপ্টেরিক্সের ফসিলে একই সাথে ডাইনোসর (সরীসৃপ) ও পাখির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আর্কিওপ্টেরিক্সের খুলি, ঠোঁট, পালক খুব চমৎকারভাবেই পাখি-সদৃশ বৈশিষ্ট্য রয়েছে আবার এর কঙ্কালতন্ত্রে দ্বিপদী ডাইনোসরের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। (চিত্রটি জার্মানি বার্লিনের für Naturkunde মিউজিয়ামের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

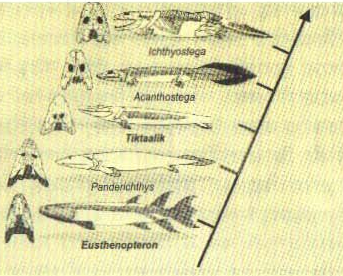

চিত্র ২:২ টিকটালিক এবং অন্য ফসিলগুলোর মধ্যে মাছ এবং উভচর জীবের মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্য সহজে বোঝা যায়। চিত্রে উল্লেখিত ইউসথেনোপ্টেরন (*Eusthenopteron*) নামের মাছ-সদৃশ জীব বাস করতো আজ থেকে সাড়ে ৩৮.৫ কোটি বছর আগে এবং ৩৫.৯ কোটি বছর পুরাতন *ইকথিওস্টেগা*'য় (*Ichthyostega*) পুরোপুরি উভচর প্রাণীর বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ২০০৬ সালে কানাডার উত্তর মেরুবর্তী ইলেসমেয়ার দ্বীপ থেকে ৩৮ কোটি বছর পুরাতন টিকটালিক ফসিলের একাধিক নমুনা উদ্ধার করা হয়েছে। টিকটালিকরা ডেভোনিয়ান যুগের শেষের দিকে নদী তীরবর্তী এলাকায় বাস করতো। (দ্রষ্টব্য : Eric Ahlberg and Jennifer A. Clark, "Palaeontology: A firm step from water to land," Nature 440, 747, 2006.)

জীববিবর্তন তত্ত্ব শুধুমাত্র জীবের ক্রমবিকাশ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই আটকে নেই, আরও অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বিবর্তনগত ইতিহাসপাঠ এবং কিভাবে ও কেন বিবর্তন প্রক্রিয়া চলমান—এসব বিষয়েও কার্যকর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পরিচালিত হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাপ্ত উপসংহারগুলো ইতোমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। উদাহরণস্বরূপ, বিবর্তনের দৃষ্টিতে শিম্পাঞ্জিরা মানুষের অধিক নিকটবর্তী আত্মীয় এবং বেবুন ও অন্যান্য বানরের সাথে এদের নৈকট্য তুলনামূলকভাবে কম, যেমনটা আগেই বলা হয়েছে। আরেকটি হলো ডারউইনের কাছ থেকে সর্বপ্রথম উত্থাপিত

প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব, যা মানুষের চোখ কিংবা পাখির ডানার মতো অঙ্গগুলোর বিবর্তনগত বিকাশ ব্যাখ্যা করে। আবার অনেক বিষয় সম্পর্কে এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়নি, কিছু বিষয় এখনো অনুমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আজও যে বিষয়গুলো অমীমাংসিত রয়ে গেছে তাদের মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, সবচেয়ে প্রাচীন জীবের বৈশিষ্ট্যাবলী কি কি এবং ঠিক কোন সময়ে তাদের উদ্ভব ঘটেছে দুনিয়াতে। প্রথম অধ্যায়ের আলোচনার পুনরাবৃত্তি করেই বলতে হচ্ছে, এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে আমাদের এখনো ঢের বাকি আছে।

এ ধরনের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও বলতে হয় জীববিবর্তনের বাস্তবতা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মহাবিশ্বের সামগ্রিক গঠন-প্রণালী কিংবা গ্যালাক্সিগুলোর উদ্ভবের সবকিছু আমরা এখনো বিস্তারিত জানি না। তাই বলে গ্যালাক্সিগুলোর অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই। গ্যালাক্সিগুলোর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে অর্জিত তথ্যগুলোও ছুঁড়ে ফেলে দেবার কোন অবকাশ নেই। বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান বর্তমানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অন্যতম একটি ক্ষেত্র এবং জীববিজ্ঞানের অন্যান্য অনুষদগুলোর অগ্রগতির সহায়তায় এক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই গুরুত্বপূর্ণ সব আবিষ্কারের ঘটনা ঘটে চলেছে।

জীববিবর্তন পাঠের মাধ্যমে পৃথিবীতে জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের চারপাশের জগতের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পিছনে জীববিবর্তন দায়ী যার মধ্যে রয়েছে : সকল জীবিত সত্তার মধ্যকার সাদৃশ্যসমূহ, জীবগুলোর মধ্যেকার বৈচিত্র্য এবং জীবের অভিযোজন যার দরুন দেখার জন্য প্রাণীদের রয়েছে চোখ, উড়ার জন্য রয়েছে ডানা এবং পানিতে নিঃশ্বাস নেবার জন্য ফুলকার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভবের পেছনে মূল ভূমিকা জীববিবর্তনের যা অন্যান্য জীবের সাথে আমাদের সম্পর্কও প্রকাশ করে। বর্তমানে জীবজগতকে বোঝার জন্য বিজ্ঞানীদের ব্যবহৃত মূল সূত্র হচ্ছে জীববিবর্তন তত্ত্ব।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিবর্তন-বিজ্ঞানী থিওডোসিয়াস ডবজানস্কি যেমনটা বলেছেন, *'জীববিবর্তনের বোধ ব্যতীত জীববিজ্ঞানে কোনকিছুই অর্থবোধক নয়।'*

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে জীববিবর্তন পাঠের গুরুত্ব অত্যধিক। আধুনিক জীববিজ্ঞান জিনেটিক সংকেতের বিন্যাস রহস্য উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল প্রজাতির ফসল তৈরি করতে পেরেছে। একই সাথে উন্নততর স্বাস্থ্যসুরক্ষা পদ্ধতির বিকাশে তথ্য সরবরাহ করেছে। সমাজজীবনে জীববিবর্তন তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মানবদেহে রোগ সৃষ্টিকারী অনেক জীবাণুর বিরুদ্ধে পূর্বে কার্যকরী ওষুধ প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেছে কিন্তু বর্তমানে কেন সেই ওষুধ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, কিভাবে এই ক্রমশ জটিলতর স্বাস্থ্য-সমস্যার মোকাবেলা করা যাবে জীববিবর্তন তত্ত্ব সে সম্পর্কে আমাদের নতুন নতুন পথ দেখাচ্ছে। বুনো ফসলের সাথে আবাদি ফসলের সম্পর্ক এবং প্রাণীদের সাথে তাদের প্রাকৃতিক শত্রুর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে বিবর্তন-বিজ্ঞানীরা কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে একটি টেকসই সম্পর্ক স্থাপনে জীববিবর্তন সম্পর্কে অবহিত থাকা আবশ্যক।

জীববিবর্তন সম্পর্কিত জ্ঞান কিভাবে একটি বিশ্বজনীন স্বাস্থ্য ঝুঁকির সমাধানে সাহায্য করতে পারে তার একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে আমেরিকার *'ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস'* এবং *'ইনস্টিটিউট অব মেডিসিন'* হতে প্রকাশিত নথি থেকে : "২০০২ সালের শেষ দিকে চীনের শত শত মানুষ একটি অজানা সংক্রামক জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট তীব্র নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হতে থাকে। *'Severe Acute Respiratory Syndrome'* সংক্ষেপে সার্স (SARS) নামে পরিচিত এই রোগটি দ্রুতই ভিয়েতনাম, হংকং এবং কানাডায় ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগে আক্রান্ত হয়ে শত শত লোক মারা যান। বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি হয় ভয়ঙ্কর আতঙ্ক। ২০০৩ সালের মার্চ মাসে আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকো'র ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিশেষজ্ঞ সার্স

রোগাক্রান্ত একজন ব্যক্তির দেহের টিস্যু থেকে আলাদাকৃত ভাইরাসের একটি নমুনা সংগ্রহ করেন। 'DNA micro array' নামক নতুন এক ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশেষজ্ঞরা মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভাইরাসটিকে সনাক্ত করতে সক্ষম হন। সার্স ভাইরাসের সনাক্তকরণে জীববিবর্তন সম্পর্কিত জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয় ছিল। এছাড়াও এই ভাইরাসের বিবর্তনগত ইতিহাস থেকে বিজ্ঞানীরা এই রোগ কিভাবে ছড়ায় সে সম্পর্কে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন।" (দ্রষ্টব্য : *Science, Evolution, and Creationism*, 2008, p. 5)।

জীবিত প্রাণীদের শারীরতত্ত্ব, তাদের ভৌগলিক বিন্যাস (জৈবভূগোল) এবং বিলুপ্ত প্রাণীদের ফসিলের (জীবাশ্মবিদ্যা) তুলনামূলক পাঠের মাধ্যমে ডারউইন এবং উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য জীববিজ্ঞানীরা জীববিবর্তনের বিভিন্ন সন্তোষজনক প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন। ডারউইনের সময় থেকে এখন পর্যন্ত এই উৎসগুলো থেকে প্রাপ্ত নমুনা শক্তিশালী এবং বিশদাকার রূপ ধারণ করেছে। একই সাথে সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিষ্ঠিত জীববিজ্ঞানের নতুন নতুন অনুষদ ও শাখা যেমন জিনেটিক্স, প্রাণরসায়নবিদ্যা, প্রতিবেশবিদ্যা, প্রাণী মনোবিদ্যা (ইথোলজি), স্নায়ুজীববিজ্ঞান এবং বিশেষত আণবিক জীববিজ্ঞান হচ্ছে বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ও বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করেছে।

এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত জীবাশ্মের বিপুল ভাণ্ডার দেখতে পেলে ডারউইন নিশ্চয়ই খুশি হতেন। জীবাশ্মের এই বিপুল ভাণ্ডার থেকে কয়েকটি আমি এখানে এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে উল্লেখ করবো। উদাহরণস্বরূপ প্রধান শ্রেণীগুলোর মধ্যবর্তী ফসিল যেমন সরীসৃপ (ডাইনোসর) এবং পাখির মধ্যবর্তী ফসিল আর্কিওপ্টেরিক্স, মাছ ও উভচর প্রাণীর মধ্যবর্তী ফসিল টিকটালিক এবং হোমিনিডদের বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় ফসিল যেগুলো এইপ এবং মানুষের মধ্যবর্তী। তবে আমরা ধারণা করতে পারি, ডারউইন আজ বেঁচে থাকলে তাকে

সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট ও খুশি করতো আণবিক জীববিজ্ঞানের সরবরাহকৃত প্রমাণগুলো। জীববিবর্তন বিষয়ে বিপুল পরিমাণ প্রমাণ ও এর ইতিহাস সম্পর্কে এই শাখা বিপুল পরিমাণ তথ্য দিয়েছে। এটা ঐতিহাসিক প্রমাণ ও আলামত সম্পর্কিত এমন একটি নির্ভরযোগ্য উৎস, যা ডারউইন-যুগে অজ্ঞাতই ছিল।

১৯৫৩ সালে ডিএনএ'র গঠন আবিষ্কারের সূত্র ধরে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আণবিক জীববিজ্ঞান অনুষদের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে জীবের বিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায় বংশগতির এই উপাদান থেকে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখবো ডিএনএ কী এবং তা কিভাবে জীববিবর্তনের আলামতকে পুনরায় প্রমাণিত করে।

ওই বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরানোর আগে আমাদের এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্যাস তৈরি করা উচিৎ। বিজ্ঞানের জগতে প্রতিটি অনুকল্প, প্রতিটি তত্ত্ব সর্বদাই নতুন তত্ত্ব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কিংবা প্রতিস্থাপিত হবার সম্ভাবনা থাকে। কোনো তত্ত্বের পক্ষে যত বেশি সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা হোক না কেন সর্বক্ষেত্রেই সম্ভাবনা থাকে যে এই পর্যবেক্ষণগত প্রপঞ্চ এবং পরীক্ষণ-সাপেক্ষ ফলাফলগুলো অন্য কোন তত্ত্ব থেকেও উৎসারিত হতে পারে। যা শুধুমাত্র জ্ঞাত বিষয়গুলোই নয়, অন্য অনুদ্ঘাটিত সত্যেরও সাক্ষ্য দেয়। যাই হোক জীববিবর্তনের মতো এমন একটি তত্ত্ব যা বিজ্ঞানের বিভিন্ন অনুষদের শাখা-প্রশাখার সমর্থন থেকে দীর্ঘ সময় ধরে প্রমাণিত হয়ে আসছে, সেই তত্ত্বের প্রত্যাখ্যাত কিংবা প্রতিস্থাপিত হবার সম্ভাবনা খুবই কম। নিশ্চিতভাবে জীববিবর্তন তত্ত্ব আরও বেশি পরিমাণ বিকশিত এবং অগ্রসর হবে। একইভাবে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগত এবং বস্তুর আণবিক গঠনের মতো তত্ত্ব কখনো প্রত্যাখ্যাত হওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়।

চলুন এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক 'জীবনের রাসায়নিক উপাদান' নামে পরিচিত ডিএনএ এবং আণবিক জীববিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত জীববিবর্তনের সাক্ষ্য-প্রমাণের দিকে।

ডিএনএ কি?

ডিএনএ হলো ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের সংক্ষিপ্ত রূপ। ডিএনএ রাসায়নিকভাবে দুটি পেঁচানো দ্বিসূত্রক সিঁড়ির মতো গঠিত। এই সিঁড়ির পাটাতনের মধ্যে রয়েছে চারটি ভিন্ন ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিডের দীর্ঘ সারি : অ্যাডেনিন (A), সাইটোসিন (C), গুয়ানিন (G), ও থায়ামিন (T)। ডিএনএ'র তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো জীবনের অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য। বংশগতির তথ্যাবলী ডিএনএ ধারণ করে, ফলে : (১) জীবের সকল জৈবিক প্রক্রিয়ার জন্য (২) জৈবিক উত্তরাধিকারের জন্য এবং (৩) জীববিবর্তনের জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

প্রথমত বলা যায় ডিএনএ জীবের সকল জৈবিক প্রক্রিয়া পরিচালনাকারী বংশগতির তথ্যগুলো ধারণ করে আছে। এই তথ্যাগুলো চারটি নিউক্লিওটাইডের দীর্ঘ সারিতে সংরক্ষিত রয়েছে অনেকটা ইংরেজি বর্ণমালার বর্ণগুলোর অর্থপূর্ণ ধারাবাহিকতার মতো। ডিএনএতে সঞ্চিত বংশগতির তথ্যাবলীর পরিমাণ বিশাল। একটি জীবের ডিএনএ অণুর দৈর্ঘ্যও অনেক বড়। এ বিষয়টাকে আমরা এভাবে বলতে পারি মানুষের জিনোম অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে মানুষ তার পিতা-মাতা থেকে যে-সংখ্যক ডিনএনএ পেয়ে থাকে, এর দৈর্ঘ্য ৩ বিলিয়ন বর্ণের ক্রমের সমান। ফলে একজন মানুষের জিনোম যদি আমরা পুরোটা ছাপাতে চাই তবে ১০০০ বইয়ের দরকার হবে যার প্রতিটির পৃষ্ঠা সংখ্যা হবে ১০০০ এবং প্রতিটি পৃষ্ঠায় যার বর্ণ সংখ্যা হবে ৩০০০ (প্রায় পাঁচশ শব্দ)। বিজ্ঞানীরা কিন্তু মানুষ কিংবা অন্য জীবদের সম্পূর্ণ জিনোমের দৈর্ঘ্য ছাপেন না। বরং ডিএনএ'র তথ্যগুলোকে কম্পিউটারে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা হয়।

ডিএনএ'র যে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হচ্ছে জৈবিক বংশগতির যথার্থতার পেছনে এটি দায়ী। ডিএনএ'র দ্বিসূত্রক সিঁড়ি দুটি একে অন্যের পরিপূরক, উভয়ে একই বংশগতির তথ্য বহন করে। ডিএনএ সংশ্লেষণের সময় দ্বিসূত্রক সিড়ির যে কোনো একটা অংশ (পরিপূরক সিঁড়ি হিসেবে) মূল সিঁড়ির মতো টেমপ্লেটের (ছাঁচ) ভূমিকা পালন করতে পারে। চারটি নিউক্লিওটাইড জোড়ার প্রতিটি জোড়া অন্য তিনটি জোড়ার মধ্যে কেবলমাত্র একটি নিউক্লিওটাইডের সাথে যুক্ত হয়। A যুক্ত হয় T-এর সাথে এবং C যুক্ত হয় G-এর সাথে। ডিএনএ'র একটি সিঁড়ির যদি ক্ষুদ্র ক্রম এরকম হয় : ...ATTCAGCA... তবে এর পরিপূরক সিঁড়িটি হবে ...TAAGTCGT...। ডিএনএ'র জৈবিক উত্তরাধিকারের সঠিক প্রবাহের পেছনে এই পরিপূরকতা মূল ভূমিকা পালন করে। কোষ বিভাজনের ফলে পুনরুৎপাদনের সময় পেঁচানো কয়েল আকৃতির দ্বিসূত্রক দুটি খুলে যায়। এবং এগুলো তাদের পরিপূরক সূত্রকের সংশ্লেষণে ভিত্তি বা টেম্পলেটের ভূমিকা পালন করে; যেন নতুন সৃষ্ট দুটি দ্বিসূত্রক একে অন্যের এবং মাতৃ-অণুর সদৃশ হয়। এভাবেই ...ATTCAGCA... ক্রমটির একটি সংশ্লেষিত পরিপূরক সূত্রক হবে ...TAAGTCGT...; মূল ডিএনএ অণুর সহকারীর প্রতিরূপ হয় এটি। একইভাবে মূল সূত্রক যদি এমন হয় ...TAAGTCGT... তবে এর পরিচালনায় সংশ্লেষিত পরিপূরক সূত্রকটি হবে ...ATTCAGCA...। এভাবে যে ডিএনএ নামক নতুন দ্বিসূত্রক অণুর জন্ম হয় তার অনুক্রমটি তার সহোদরা এবং মাতৃ-অণুর ক্রমের মতোই হয়।

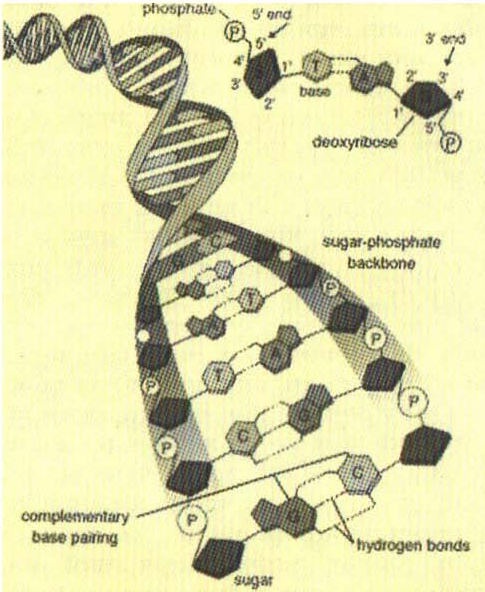

চিত্র ৩:১ ডিএনএ'র ছবি

ডিএনএ'র তৃতীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি। একে জীবের বিবর্তনের কাঁচামাল হিসেবে অভিহিত করা হয়। ডিএনএ'র প্রতিলিপি তৈরির সময় নিউক্লিওটাইড অনুক্রমের রক্ষিত তথ্যেরও পুনরুৎপাদন ঘটে থাকে। পূর্বে যেমনটা বলা হয়েছে

প্রতিবার প্রতিলিপিকরণে দুটি ডিএনএ-অণুর তৈরি হয় যারা একে অন্যের এবং তাদের মাতৃ-অণুর প্রতিরূপ। প্রতিলিপিকরণটা এই প্রক্রিয়ায় ঘটলেও তা পুরোপুরি নিখুঁত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে ডিএনএ-অণুতে যে মিউটেশন ঘটে থাকে তার ফলে উৎপন্ন কোষগুলো তাদের মাতৃ-কোষগুলো থেকে (এবং একে অন্যের থেকেও) নিউক্লিওটাইড ক্রমে এবং ডিএনএ'র দৈর্ঘ্যেও ভিন্ন হয়ে থাকে। মিউটেশন প্রায়ই একটি মাত্র 'অক্ষরে' (নিউক্লিওটাইড) হয়ে থাকে, আবার কোনো কোনো সময় একাধিক অক্ষর জুড়েও ঘটতে পারে। কোনো একটি জীবের একটি মাত্র কোষের ডিএনএ-তে সর্বপ্রথম যে মিউটেশন ঘটে থাকে, এবং পরিবর্তিত নতুন ডিএনএ'র প্রথম কোষ থেকে এর সকল আপত্য কোষে তা সঞ্চারিত হয়।

মিউটেশনের একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে হিমোফিলিয়া নামের প্রাণঘাতী রোগ। ইউরোপের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই রোগের প্রভাব মারাত্মক। হিমোফিলায় রোগটি নির্ধারিত হয় X ক্রোমোজোমের একটি মিউটেশন থেকে। মানুষের লিঙ্গনির্ধারক ক্রোমোজোম হচ্ছে X। নারীর রয়েছে দুটি X ক্রোমোজোম আর পুরুষের রয়েছে একটি X এবং Y ক্রোমোজোম। যে-সব নারীর একটি X ক্রোমোজোমে হিমোফিলিয়ার মিউটেশন ঘটেছে তারা আর এই রোগে ভুগেন না। কিন্তু তারা তাদের পুত্র সন্তানদের দেহে (গড়ে অর্ধেক) তা সঞ্চারিত করেন। ফলে সন্তানদের মধ্যে X ক্রোমোজোমে হিমোফিলিয়া মিউটেশন দেখা যায়।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার দেহে একটি X ক্রোমোজোমে হিমোফিলিয়া নামক মিউটেশন ঘটেছিল। এই মিউটশেন পরবর্তীতে রানীর কন্যা ও পৌত্রীদের মাধ্যমে রাশিয়া, স্পেন এবং ইউরোপের অন্যান্য রাজপরিবারেও সঞ্চারিত হয়। রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাসের একমাত্র পুত্র জারেভিজ অ্যালেক্সিজ তাঁর মাতা আলেকজান্দ্রার কাছ (রানী ভিক্টোরিয়ার পৌত্রী) থেকে এই রোগের উত্তরাধিকারী হন। এছাড়াও এই রোগের শিকার

হয়েছিলেন স্পেনের রাজমুকুটের উত্তরাধিকারী আলফনসো। আলফনসোর মাতা (স্পেনের রাজা ত্রয়োদশ আলফনসোর স্ত্রী) ইনা ব্রিটেনের রানী ভিক্টোরিয়ার আরেক পৌত্রী। ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন দুই রাজপরিবারে উত্তরাধিকারীদের হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে তাদের রাজবংশের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

জীববিবর্তন শুধুমাত্র জনন কোষে (ডিম্বাণু ও শুক্রাণু) সংঘটিত মিউটেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অথবা যে-সব কোষ থেকে জনন কোষ সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যে সংঘটিত মিউটেশন বিবর্তনে ভূমিকা রাখে। কারণ পরবর্তী প্রজন্মের সূচনা এ-সকল কোষের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। অন্যান্য কোষগুলোতে (যেমন দেহকোষ) সংঘটিত মিউটেশনের অধিকাংশের গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল নেই। এরা নজরের আড়ালেই থেকে যায়। তবে এইসব কোষের মধ্যে কিছু মিউটেশন আবার ক্যান্সার কিংবা অন্যান্য রোগের জন্ম দিতে পারে। অনেক উদ্ভট ঘটনাও ঘটতে পারে এ সময়, যেমন একজন ব্যক্তির দুই চোখের রঙ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে। তবে এই ধরনের ঘটনা কদাচিৎ ঘটে থাকে কারণ যে কোন অবস্থাতে মিউটেশন একটি দুর্লভ ঘটনা।

অসংখ্য জীবের মধ্যে সংঘটিত মিউটেশনের হার নির্ণয় করা হয়েছে। এটা মূলত করা হয়েছে নতুন বংশধরদের সনাক্তকরণে, যাদের উপর বংশগতির ধারায় মিউটেশনের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। যেমন দুই চোখের ভিন্ন ভিন্ন রঙ সৃষ্টি হয়েছে কিংবা বিপাকীয় প্রক্রিয়ার প্রভাবের দরুন নতুন প্রজন্মের মধ্যে রোগ সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর কোষে মিউটেশনের হার হলো এক লক্ষ থেকে দশ লক্ষে একটি। যদিও জীবজগতে মিউটেশনের হার খুব কম, তারপরেও প্রতিটি প্রজাতির প্রতিটি প্রজন্মে নতুন মিউটেশন ঘটে থাকে। প্রতিটি প্রজাতিরই সদস্য সংখ্যা অনেক এবং প্রতিটি সদস্যের দেহে জিন সংখ্যাও অসংখ্য। বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৬০০ কোটিরও বেশি। যদি প্রতি দশ লাখের মানুষের জন্য একটি করে

মিউটেশন ঘটে, তবে প্রতিটি সম্ভাব্য মিউটেশনের জন্য পৃথিবীর তাবৎ জীবিত মানুষেরা একত্রে ৬০০০ নতুন সৃষ্ট মিউটেশন বহন করবে।

ডিএনএ-তে মিউটেশনের ফলে জীবের ক্রমবিকাশ ঘটে। কিন্তু মিউটেশনের ঘটনা যদি বর্তমানের তুলনায় বেশি সংখ্যক হারে ঘটতো, তবে আশঙ্কা করা যায় জীবজগতে একাধিক ত্রুটি থেকে শুরু করে সামগ্রিক ভারসাম্যহীনতা তৈরি করতো। মিউটেশনের ফলে আসলে উপকারের বদলে ত্রুটি কিংবা রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকে। কারণ মিউটেশনগুলো জীবের ডিএনএ'র প্রতিষ্ঠিত ক্রমে বিঘ্ন ঘটায়। হাজার প্রজন্ম ধরে এই ক্রম নির্ধারিত হয়েছে একটি জীবের বেঁচে থাকা ও জীবন ধারণের স্বীয় পরিবেশে বংশবৃদ্ধির জন্য সহায়তার কাজে। কিন্তু মিউটেশনের ফলে প্রতিটি প্রজন্মে অনেক নতুন জিনগত ভ্যারাইটি বা প্রকরণসমৃদ্ধ জীবের সৃষ্টি হয়। এই ভ্যারাইটি যদি প্রাণঘাতী কিংবা ব্যাপক ক্ষতিকারক না হয় তবে পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে প্রবাহিত ভ্যারাইটির সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ জীবজগতের প্রজাতিগুলো আসলে জিনগতভাবে আলাদা আলাদা সদস্য নিয়ে গঠিত নয়। বরং বলা যেতে পারে প্রজাতির সদস্যগুলো একে অন্যের থেকে অসংখ্য মিউটেশনের মাধ্যমে আলাদা। এ কারণে যখন কোনো নতুন প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে কোনো প্রজাতি পুরোপুরি বিলুপ্ত না হয়ে নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তখন আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি ডিডিটি'র কথা। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে শুরু করে শেষ ভাগ পর্যন্ত পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে ডিডিটি কীটনাশকের বিপুল ব্যবহার হয়েছে নতুন করে পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেখানকার একশর বেশি কীটপতঙ্গ-প্রজাতি কীটনাশক-প্রতিরোধক্ষম হয়ে ওঠেছে। যদিও এই কীটপতঙ্গগুলো তাদের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কখনো ডিডিটির মতো সংশ্লেষিত যৌগের মুখোমুখি হয়নি, তা সত্ত্বেও পূর্ববর্তী কিছু মিউটেশনের কারণে তাদেরকে ডিডিটি'র উপস্থিতিতেও টিকে থাকতে সক্ষম করে

তুলেছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এই 'অভিযোজন' দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। ডিডিটিযুক্ত পরিবেশে কেবল ডিডিটি প্রতিরোধক্ষম প্রজাতিরাই টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা পরবর্তী প্রজন্মগুলোর সূচনা ঘটিয়েছে।

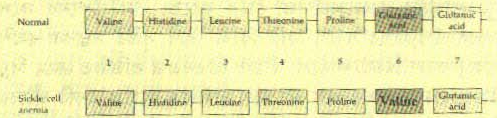

চিত্র ৩:২ মানুষের হিমোগ্লোবিনের বিটা শিকলের প্রথম সাতটি অ্যামিনো অ্যাসিডের ছবি। বিটা পলিপেপটাইডে ১৪৬টি অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে। মিউটেশনের ফলে বিটা পলিপেপটাইডের জিনের সংকেতে পরিবর্তন ঘটে। গ্লুটামিক অ্যাসিডের স্থলে ভ্যালিন অ্যামিনো অ্যাসিডের সংযুক্তি ঘটে। যেসব ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা-মাতা থেকে এই মিউটেড জিন পায় তাদের শরীরে স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন-A উৎপন্ন হয় না। ফলে এরা সিকল সেল অ্যানিমিয়া নামের মারাত্মক রক্তশূন্যতার রোগে ভোগেন। আবার যেসব ব্যক্তি তাদের পিতামাতার একজনের কাছ থেকে মিউটেড জিন এবং অন্যজনের কাছ থেকে স্বাভাবিক জিন উত্তরাধিকারসূত্রে পান তারা আবার সিকল সেল অ্যানিমিয়া রোগে আক্রান্ত হন না। এমন কী ম্যালেরিয়া রোগ থেকেও প্রতিরোধী থাকেন তারা। এটা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয় একজনের দেহে দুইটা ভিন্ন ধরনের জিনের অস্তিত্ব থাকা যেমন স্বাভাবিক জিন এবং মিউটেড জিন। বিশ্বের প্রচুর ব্যক্তির দেহে ভিন্নরূপী দুটো জিনের অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু সমরূপী দুইটা জিন একসাথে একজন ব্যক্তির দেহে থাকা দুর্লভ ঘটনা এবং একই সাথে ক্ষতিকারক।

একই ধরনের প্রক্রিয়ায় রোগবাহী জীবাণু ও অন্যান্য পরজীবীরা অ্যান্টিবায়োটিক এবং অন্যান্য ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। একজন ব্যক্তি যখন একটি নির্দিষ্ট রোগের জন্য একটি অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করেন তখন ওই রোগের অধিকাংশ জীবাণুই অ্যান্টিবায়োটিকের কারণে মারা যায়। যেমন যক্ষ্মার ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এমন অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করলে আমাদের শরীরে তখন

ওই ব্যাকটেরিয়ার অধিকাংশই মারা যায়। কিন্তু মিলিয়নের অধিক সংখ্যক যক্ষ্মার ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে এমন কোনো সদস্য থাকতে পারে যার মিউটেশনের ফলে একে অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষম করে তোলে। এই প্রতিরোধক্ষম ব্যাকটেরিয়া টিকে থাকবে এবং বংশবৃদ্ধি করবে। ওই অ্যান্টিবায়োটিকটি তখন আর প্রতিরোধক্ষম ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করতে পারবে না। এ-কারণে সাম্প্রতিককালে ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগগুলোর চিকিৎসার জন্য একটি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার না করে একাধিক অ্যান্টিবায়োটিকের সংমিশ্রণ দ্বারা 'ককটেল অ্যান্টিবায়োটিক বানিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এখানে হিসাব করা হয়, মিউটেশনের ফলে অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ঘটনা যদি এক মিলিয়নে একটি হয়, তবে একটি ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে তিনটি অ্যান্টিবায়োটিকের প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা তিনটি মিউটেশন বহনের সম্ভাবনা প্রতি মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়নে একটি। একবারে অসম্ভব না হলেও কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহে তিনটি অ্যান্টিবায়োটিকের সংমিশ্রণে তৈরি 'ককটেল অ্যান্টিবায়োটিক' প্রতিরোধক্ষম এমন ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা খুব কম।

যেসব মিউটেশনের ফলে ব্যাকটেরিয়াগুলো অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধক্ষম হয়ে উঠে সেসব মিউটেশন ব্যাকটেরিয়ার জন্য উপকারী হয়ে দেখা দেয় তাই এগুলো ব্যাকটেরিয়ার জনগোষ্ঠীতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের পূর্বপুরুষদের বিবর্তনের ইতিহাসে সংঘটিত উপকারী মিউটেশনগুলো সেই সব বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী, যেগুলো আমাদেরকে 'মানব' পরিচয়ে উদ্ভূত করেছে। এক্ষেত্রে ফক্সপি২ (FOXP2) জিন একটি উদাহরণ। এটিই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত জিন, যার ক্রিয়া ভাষার বিকাশ বা কথা বলার ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। ফক্সপি২ জিন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে। এটা দেহের ফুসফুসের আবরণী (Epithelium) টিস্যুর গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানব জিনোম পরীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, মানুষের বংশধারায় ফক্সপি২

জিনে দুটি মিউটেশন সংঘটিত হয়েছে, মানুষের দেহে একটি নতুন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর তা হলো কথা বলার ক্ষমতা বা ভাষা প্রকাশের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। এই মিউটেন্ট জিন প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা আমাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে নির্বাচিত হয়েছে এবং মানবকুলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। ধারণা করা হয় প্রায় দুই লক্ষ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ হোমিনিডদের ফক্সপি২ জিনে এই মিউটেশন ঘটেছিল; এই ঘটনাটি মোটামুটিভাবে আধুনিক মানুষের উদ্ভবকালের সমসাময়িক। সাম্প্রতিককালে মানুষের একটি পরিবারে ফক্সপি২ জিনের মধ্যে নতুন মিউটেশন লক্ষ্য করা গেছে এবং এর দরুন এই পরিবারের উত্তরসূরিদের মধ্যে কথা বলায় ব্যাপক অসংলগ্নতা দেখা দিয়েছে।

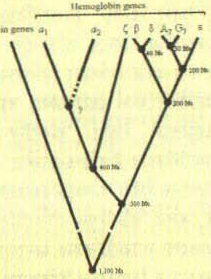

চিত্র ৩:৩ গ্লোবিনের জিনের বিবর্তনীয় ইতিহাস আমাদের অক্সিজেনের বিপাকক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য দেয়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের অনেক জিনেরই প্রতিলিপি বা দ্বৈত সত্তার তৈরি হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে আদি জিন ও প্রতিলিপিকৃত জিন আলাদা আলাদা ক্রিয়া করে। চিত্রে উল্লেখিত বিন্দু দ্বারা মিলিয়ন বছরের ব্যবধানে পূর্বসূরি জিন থেকে প্রতিলিপিকৃত নতুন জিনের উদ্ভব দেখানো হয়েছে। প্রথম দিককার প্রতিলিপিকৃত একটা জিন (মায়োগ্লোবিন) পেশিতে অক্সিজেনের বিপাকীয় কাজে ব্যবহৃত হতো এবং অন্য জিনটি (হিমোগ্লোবিন) রক্তে অক্সিজেন পরিবহনে সহায়তা করতো। পরবর্তীতে হিমোগ্লোবিন জিনের আরো প্রতিলিপি তৈরি হওয়ার ফলে অন্যান্য কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

জীবের বিবর্তনে এক ধরনের মিউটেশন গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল নিয়ে আসে, সেটা হচ্ছে জিনের দ্বৈততা (প্রতিলিপি) সৃষ্টি করে। যদি একটি জিনের দ্বৈত সত্তার (প্রতিলিপি) সৃষ্টি হয় তবে নতুন সত্তাটি হয়তো সম্পূর্ণ নতুন একটি কাজে ব্যবহৃত হবে আর আদি জিনটি তার পূর্বের ভূমিকা পালন করে যাবে। জিনের দ্বৈততার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো গ্লোবিন জিনের বিবর্তন এবং শ্বসনকার্যের সাথে এর সম্পর্ক। গ্লোবিনের আদি জিনে মিউটেশনের ফলে এই দ্বৈত রূপ তৈরি হয়েছে। এখন একটি জিন (মায়োগ্লোবিন) পেশিতে অক্সিজেনের বিপাকীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। আর অন্যটি (হিমোগ্লোবিন) রক্তে অক্সিজেনের বিপাকীয় কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। হিমোগ্লোবিন জিনে পুনরায় মিউটেশনের ফলে দ্বৈত সত্তার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে আধুনিক টেট্রামার হিমোগ্লোবিনের সৃষ্টি হয়েছে যার একই ধরনের দুটি উপাদান (পলিপেপটাইড) এবং অন্য ধরনের আরো দুটি উপাদান রয়েছে। 'হিমোগ্লোবিন-এ' মানুষের পূর্ণাঙ্গ হিমোগ্লোবিনের ৯৮% গঠন করে থাকে, এরা দুটি আলফা এবং দুটি বিটা পলিপেপটাইড দিয়ে গঠিত। অতিরিক্ত দ্বৈততার দরুন অতিরিক্ত বিশেষায়ন ঘটেছে জিনের কার্যাবলীতে। মানব ভ্রূণে সক্রিয় থাকা গ্যামা জিন এর উদাহরণ।

ডিএনএ-কে 'গুরু অণু' বলা হয় কারণ তা সকল জীবের বৃদ্ধি ও জৈবিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পরিবেশের সাথে ডিএনএ'র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে (অর্থাৎ কোষীয় পরিবেশ এবং বাহ্যিক পরিবেশ যেমন ও নদী কিংবা জঙ্গলে জীবটি বসবাস করে থাকে) জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারিত হয়। এসব বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় 'ফিনোটাইপ'। ফিনোটাইপ বলতে কোনো জীবের শুধু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যই নয়, তার আচার-আচরণকেও নির্দেশ করে। ফিনোটাইপ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অধিকাংশই জানতে পেরেছেন।

ডিএনএ তার গুরুদায়িত্ব দুটি ধাপে সম্পন্ন করে থাকে। প্রথম ধাপে ডিএনএ দ্বিসূত্রক নিউক্লিওটাইডের ক্রমে সঞ্চিত তথ্যগুলো 'পুনর্লিখিত' হয়, 'ম্যাসেঞ্জার আরএনএ' (mRNA) নামক নতুন এক

ধরনের অণুতে প্রতিলিপিকরণ ঘটে (আরএনএ'র পুরো নাম রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড)। প্রতিলিপিকরণের প্রক্রিয়ায় একটি ডিএনএ ক্রম সেই একই নিয়ম অনুসরণ করে যে নিয়মানুযায়ী ডিএনএ'র দ্বৈতকরণ ঘটে। ব্যতিক্রম হলো এক্ষেত্রে থায়ামিন এর পরিবর্তে আরএনএ'র থাকে ইউরাসিল (U)। এভাবেই ... ATTCAGCA... ডিএনএ খণ্ডাংশটি ...UAAGUCGU... আরএনএ ক্রমে প্রতিলিপিত হয়।

জীবকোষের নিউক্লিয়াসে ডিএনএ অবস্থান করে সেখানে তা mRNA-তে রূপান্তরিত হয়। নিউক্লিয়াস থেকে এই mRNA কোষের মূলদেহ বা সাইটোপ্লাজমে চলে যায়। সেখানে এই mRNA একটি প্রোটিন অথবা পলিপেপটাইডে 'অনূদিত' হয়। আসলে পলিপেপটাইডেরা হলো এক ধরনের প্রোটিন, যদিও কিছু কিছু প্রোটিনে একাধিক পলিপেপটাইড থাকে। যেমন আমাদের শিরা ও ধমনীতে উপস্থিত হিমোগ্লোবিনগুলো চার ধরনের পলিপেপটাইড দিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে দুটি হলো আলফা হিমোগ্লোবিন, অন্য দুটি বিটা হিমোগ্লোবিন। প্রোটিন হল অ্যামিনো অ্যাসিডের দীর্ঘ শৃঙ্খল। জীবজগতে বিশ রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে। নিউক্লিওটাইডের ক্রমে যে-সব ডিএনএ তথ্য সংরক্ষিত থাকে সেগুলো অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমে অনূদিত হয়ে যায়।

প্রোটিনগুলো বিশটি ভিন্ন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত। চার বর্ণের ডিএনএ এবং আরএনএ'র ভাষা থেকে কিভাবে বিশ বর্ণের ভাষায় অনুবাদ সংঘটিত হয়? কৌশলটা হলো mRNA-কে প্রতিবার তিনটি অক্ষর দিয়ে পড়া হয়ে থাকে। তিনটি ক্রমায়ন্বয়িক অক্ষরের প্রত্যেককে বলা হয় এক একটি 'ট্রিপলেট' বা 'কোডন'। যেমন AGC নামের ট্রিপলেটকে পড়া হয় 'সেরিন' হিসেবে এবং AUG ট্রিপলেটকে পড়া হয় মিথিওনিন হিসবে। অ্যার্জিনিন এবং মিথিওনিন নামের দুটো ট্রিপলেট বিশটি অ্যামিনো অ্যাসিডেরই অন্তর্ভূক্ত। জীবজগতে সম্ভাব্য ৬৪ ধরনের ত্রয়ী জোড় (কোডন)

রয়েছে যেগুলো নিউক্লিওটাইডের চারটি অক্ষর দিয়ে গঠিত। ফলে জিনেটিক সংকেত অতিরিক্ত হয়ে যায়। কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড অনেক ধরনের কোডন দ্বারা তৈরি হতে পারে। যেমন পূর্বের উল্লেখিত সেরিন নামক প্রোটিনটি AGC ট্রিপলেট ছাড়াও AGU ট্রিপলেট দিয়েও তৈরি হয়ে থাকে।

উল্লেখ করার মতো জীবদেহে দুই ধরনের প্রোটিন রয়েছে। এসব প্রোটিনের কেউ কেউ জীবের গুরুত্বপূর্ণ গাঠনিক উপাদান রয়েছে। যেমন কোলাজেন নামের প্রোটিন হাড়ের মূল উপাদান। অন্যান্য প্রোটিন হলো উৎসেচক (এনজাইম) যারা জীবদেহে অনুঘটক হিসেবে জীবের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে। উৎসেচকদের কেউ কেউ 'আণবিক যন্ত্র' হিসেবেও বর্ণনা করেন। কারণ এরা কোষের অভ্যন্তরের সকল জৈবিক প্রক্রিয়াকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করে থাকে। অর্থাৎ উৎসেচকরা এক উপাদান থেকে অন্য উপাদানে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। বলতে গেলে অন্যান্য জৈবিক উপাদানের তুলনায় উৎসেচকদের যান্ত্রিক দক্ষতা অনেক বেশি। ন্যানোটেকনোলজি নামের আধুনিক বিজ্ঞানের নতুন অনুষদের লক্ষ্য হচ্ছে এমন অণু তৈরি করা যারা উৎসেচকদের ন্যায় কাজ করতে সক্ষম হবে। এই উৎসেচক-সদৃশ যন্ত্র ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত পণ্য তৈরি করা যেগুলো আজকের যন্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির তুলনায় অনেক অনেক বেশি দক্ষ হবে। বর্তমানকালের বহুল আলোচিত তথ্যপ্রযুক্তিও এই ন্যানোটেকনোলজির আওতার বাইরে নয়।

কোষের ভিতরের বেশিরভাগ রাসায়নিক উপাদানই ধারাবাহিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফসল। এরা প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন উৎসেচক দ্বারা অনুঘটিত হয়েছে। প্রোটিনের গঠনে যে জিনেটিক তথ্য ব্যবহৃত হয় সেগুলো প্রতিটি ক্ষেত্রেই ডিএনএ'র নিউক্লিওটাইড অনুক্রমে সঞ্চিত থাকে। জৈবিক বংশগতির ধারা বজায় রাখার পেছনেও এর ভূমিকা

রয়েছে। এবং ডিএনএ মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট বিবর্তনের পেছনেও এটি সমানভাবে দায়ী।

দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে, জীববিবর্তন তত্ত্ব একই সাথে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং বাস্তব ঘটনা। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা জীবাশ্মবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, ভূ-জীববিদ্যা এবং আণবিক জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন উদাহরণ থেকে এর প্রমাণগুলো নিরীক্ষা করবো। জীববিজ্ঞানীদের জীবজগত সম্পর্কে তথ্য-উপাত্তের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। জীববিবর্তনের আলোকে প্রতি বছর শত শত বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র এবং জার্নাল প্রকাশিত হয়। বইয়ের শুরুতে যেমনটা বলা হয়েছে, বিজ্ঞানীরা বংশগতির তত্ত্ব, পরমাণু তত্ত্বের মতো অন্য সব প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মতোই জীবের বিবর্তনকেও একই নিশ্চয়তার সাথে গ্রহণ করেছেন। এখানে কোনো দ্বিমত নেই।

সকল বিজ্ঞানীর কাছে কি বিবর্তন তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য?

দুনিয়ার সকল জীববিজ্ঞানীদের অধিকাংশই জীববিবর্তন তত্ত্বকে গ্রহণ করেছেন। আজকের একবিংশ শতাব্দীতে এসে জীববিবর্তনের প্রমাণ সম্পর্কে পেশাদার বিজ্ঞানী-গবেষকদের কেউই একে অস্বীকার করতে পারবেন না। বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে এখন একমত যে আমাদের জীবজগতে প্রাণী ও উদ্ভিদের বিবর্তনগত উৎপত্তি নিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-প্রক্রিয়ার উপসংহার পাওয়া গেছে যা যে কোন প্রকার যৌক্তিক সন্দেহের ঊর্ধ্বে। বিবর্তনের প্রমাণ যথেষ্ট শক্তিশালী এবং সর্বব্যাপী। জীববিজ্ঞানের সকল অনুষদ থেকেই প্রমাণগুলো পাওয়া গিয়েছে; এবং বলতে গেলে বিবর্তন তত্ত্বের অনেক প্রমাণ সম্পর্কে ডারউইনেরও তেমন ধারণা ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ডারউইন এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা জীবের বিবর্তন সম্পর্কে শারীরবিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা, জৈবভূগোল, ভূতত্ত্ব, প্রত্নজীববিজ্ঞান থেকে অনেক সন্তোষজনক তথ্য-প্রমাণ যোগাড় করতে পেরেছিলেন। ডারউইন যুগের পরে আরও শক্তিশালী এবং অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বংশগতিবিদ্যা, জৈবরসায়ন, স্নায়ুজীববিজ্ঞান, আণবিক জীববিজ্ঞান, প্রতিবেশবিদ্যার মতো অনেক নিত্যনতুন অনুষদ থেকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি জীববিবর্তনের গবেষণা তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে পরিচালিত হয়। প্রথমটি হচ্ছে বিবর্তনের আলামত। সত্য হচ্ছে এ বিষয়টা এখন আর জীববিজ্ঞানের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে নেই। কেবলমাত্র সাধারণ মানুষকে জীববিবর্তন ব্যাখ্যায় এবং অস্বীকারকারীদের সাথে যুক্তিতর্কে ব্যবহৃত হয়। কারণ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বিবর্তনের প্রমাণ এতোই বিশাল যে একে আর

নতুন করে নিরূপণের প্রয়োজন নেই। তারপরও বলতে হয় প্রতিনিয়ত বিবর্তনের প্রমাণ সঞ্চিত হয়ে চলছে।

বিবর্তন নিয়ে গবেষণা আজকাল আরও অধিকতর জ্ঞানার্জনের খোঁজে নিমগ্ন। বিবর্তন কিভাবে ঘটে, এ প্রক্রিয়ার ক্রিয়াকৌশল, জীবের বিবর্তনীয় ইতিহাস, জীবের জাতিজনিক শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদি এখন মুখ্য বিষয়। বিজ্ঞানীরা বিশেষ কিছু জীবের বিবর্তনীয় ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য গুরুত্ব দিচ্ছেন। কারণ এই জীবগুলো আমাদের কৃষি, ঔষধি এবং শিল্পের মতো বিভিন্ন প্রায়োগিক ক্ষেত্রের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন বিজ্ঞানীদের ভাষ্য অনুযায়ী টিওসিন্ট (Teosinte) নামের মেক্সিকোর এক ধরনের বন্য উদ্ভিদ থেকে বর্তমানের ধান গাছের উদ্ভব হয়েছে।

কোনো জীব যখন মারা যায় তখন সাধারণত শিকারি প্রাণী ওই মৃত জীবের মাংস ভক্ষণ করে। ব্যাকটেরিয়া ওই মৃত জীবের বাকি অংশ মাটির সাথে পচিয়ে ফেলে কিংবা আবহাওয়ার প্রভাবে এর দেহের অবশিষ্টাংশ ধ্বংস হয়ে যায়। কিছু বিরল ক্ষেত্রে মৃত জীবের দেহের কিছু অংশবিশেষ যেমন দাঁত, হাড় কিংবা খোলসের মতো কঠিন অঙ্গগুলো কাদায় ডুবে গিয়ে কিংবা অন্য কোন উপায়ে শিকারি প্রাণী, বিয়োজন প্রক্রিয়া এবং আবহাওয়ার প্রভাব থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। এরা পাললিক শিলার মাঝে অনির্দিষ্টকাল ধরে ফসিল হিসেবেও সংরক্ষিত থাকতে পারে। কাদামাটি অথবা পলিমাটি সময়ের সাথে সাথে চুনাপাথর এবং অন্যান্য শিলায় পরিণত হয়।

ফসিল রেকর্ড যদিও এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে অসম্পূর্ণ। মৃত জীবের স্বল্প সংখ্যক পাললিক শিলায় অথবা চুনাপাথরের খনিতে দুর্লভভাবে ফসিল হিসেবে সংরক্ষিত হয়। প্রত্নজীববিজ্ঞানীরা এইসব ফসিলের খুব সামান্য পরিমাণ উদ্ধার করে গবেষণা করতে পেরেছেন। তথাপি অনেক ক্ষেত্রেই প্রজাতির উদ্ভব ও পরিবর্তনের প্রায় সব ধাপের ফসিল উদ্ধার করে বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এগুলোকে পুনর্গঠিত করতে পেরেছেন। ঘোড়ার বিবর্তনকে এক্ষেত্রে

উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। আজকের যুগে ঘোড়া হিসাবে যে প্রাণীকে আমরা চিনি তার উদ্ভব হয়েছে *হাইরাকোথেরিয়াম* (*Hyracotherium*) নামক কুকুর আকৃতির প্রাণী থেকে। এই প্রাণীর প্রত্যেক পায়ে কয়েকটি ক্ষুর ছিল এবং লতাপাতা, ছোট ছোট চারা, গাছের প্রশাখা এবং নরম কাণ্ডযুক্ত গুল্মের পাতা খাওয়ার উপযোগী তার অনেকগুলো দাঁত ছিল। *একুস* (*Equus*) নামক ক্ষুরবিশিষ্ট এবং চরে খাওয়া তৃণভোজী প্রাণীগুলো আধুনিক ঘোড়া থেকে প্রায় ৫০ মিলিয়ন বছর আগে বাস করতো। *হাইরাকোথেরিয়াম* থেকে *একুস* পর্যন্ত ঘোড়ার পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন ফসিলের নমুনা বিজ্ঞানীরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার করে এর বিবর্তনীয় ইতিহাসকে সমন্বিত করতে পেরেছেন।

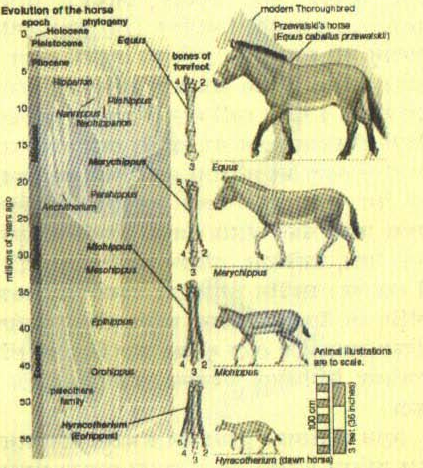

চিত্র ৪:১ ঘোড়ার বিবর্তনের ছবি। বাম পাশে মিলিয়ন বছরের সময়সীমাকে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান অবধি দেখানো হয়েছে। এখানে একটি সদ্যজাত এবং একটি *Przewalski* ঘোড়াকে দেখানো হয়েছে। চিত্রের প্রশাখাগুলো বিভিন্ন সময়ে বসবাসকারী প্রজাতিগুলোকে নির্দেশ করে। এদের বেশিরভাগই বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। প্রশাখাগুলোর প্রসারতা প্রজাতিদের সংখ্যা নির্দেশ করে। চিত্রে দেখানো ঘোড়ার সবচেয়ে প্রাচীন পূর্বপুরুষ হচ্ছে *হাইরাকোথেরিয়াম*। প্রায় ৫০ মিলিয়ন আগে বসবাসকারী কুকুর-আকৃতির ঘোড়া। পরবর্তীতে এর সফল উত্তরসূরিরা ক্রমান্বয়ে বড় আকৃতি ধারণ করেছে। ভিন্নভিন্ন খাদ্যাভাস এবং জীবন-ধারণ প্রক্রিয়ায় অভিযোজনের দরুন তাদের দাঁতের গঠনে ভিন্নতা এবং ক্ষুরের সংখ্যা কম গেছে। (সৌজন্যে : Encyclopædia Britannica, Inc।)

জীবজগতের বৃহত্তর শ্রেণীগুলোর 'মধ্যবর্তী ফসিলগুলো' বিশেষভাবে কৌতূহলদ্দীপক। অনেকে এই মধ্যবর্তী ফসিলগুলোকে 'মিসিং লিংক' বলে অভিহিত করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এই মিসিং লিংকের দুটি উদাহরণ দেখেছি। আর্কিওপ্‌টেরিক্স (*Archaeopteryx*) এবং টিকটালিক (*Tiktaalik*) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হওয়ায় পুনরুল্লেখ করছি। প্রায় ৬০ মিলিয়ন বছর আগে বসবাসকারী আর্কিওপ্‌টেরিক্স হলো সরীসৃপ ও পাখির একটি মধ্যবর্তী যোগসূত্র। আর্কিওপ্‌টেরিক্সের ফসিলে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় প্রাণীটির দেহে পাখির মতো পালক ছিল যদিও কঙ্কাল ছিল সরীসৃপের মতো। আর্কিওপ্‌টেরিক্সের খুলি ও ঠোঁট ছিল পাখির মতো। বিগত বছরগুলোতে আর্কিওপ্‌টেরিক্সের অসংখ্য ফসিল উদ্ধার হয়েছে। প্রথম ফসিলটি আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৮৬১ সালে, ডারউইনের '*অরিজিন অব স্পিসিজ*' বইটি প্রকাশের দুই বছর পর। ডারউইন তাঁর বইয়ের পরবর্তী সংস্করণগুলোতে এই প্রাণীটির কথা উল্লেখ করেছিলেন। আর্কিওপ্‌টেরিক্সের সর্বশেষ ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে আজ থেকে দুইবছর আগে। এই ফসিলটি বর্তমানে আমেরিকার উইসকন্সিনে একজনের ব্যক্তিগত জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

বিগত বছরগুলোতে উভচর জীব ও মাছের অনেকগুলো মধ্যবর্তী ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। এই আবিষ্কারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি

হচ্ছে টিকটালিক, ২০০৬ সালে যার কথা জানা যায়। কানাডার মেরু অঞ্চলে অবস্থিত নুনাভুট এলাকার ইলেসমেয়ার দ্বীপের প্রায় ৩৮ কোটি বছর পুরাতন পাললিক শিলা থেকে টিকটালিক ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নজীববিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে এই শিলাগুলোর উপর অনুসন্ধান করছিলেন। কারণ এই সময়কালেই পৃথিবীতে উভচর জীবের উদ্ভব ঘটেছিল বলে ধারণা করা হয়। মাছ থেকে উভচর কিংবা সরীসৃপ থেকে পাখির বিবর্তন সম্পর্কে জানার চেয়ে বেশিরভাগ মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানুষ ও পূর্বপুরুষ প্রাইমেটদের মধ্যবর্তী ফসিল। আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিগত একশ বছরে শতশত হোমিনিড ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে।

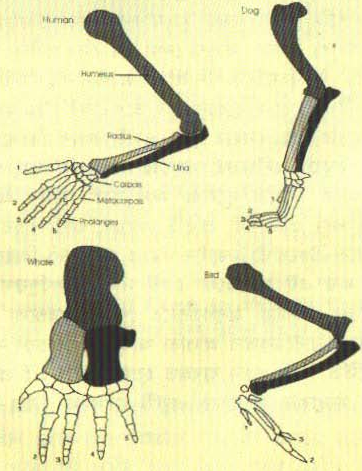

চিত্র ৪:২ চারটি মেরুদন্ডী প্রাণীর বাহুর কঙ্কাল। যেগুলো প্রায় দেখতে অভিন্ন এবং গঠনে অনুরূপভাবে সারিবদ্ধ রয়েছে। যদিও মানুষ, কুকুর, তিমি এবং পাখির পেশিগুলো ভিন্নভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। জীববিবর্তন-বিজ্ঞানীদের মতে একই সাধারণ উৎস উদ্ভূত হলেও পর্যায়ক্রমিকভাবে রূপান্তরের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ধারার জীবনযাপনে অভিযোজিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পেশির একইরূপে গঠন ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। দৈহিক গঠনের এই সাদৃশ্য নিকট সম্পর্কীয় জীবদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (যেমন কয়েক প্রজাতির ইঁদুর) আবার এই সাদৃশ্য বিবর্তনীয় ইতিহাসের দূরবর্তী সম্পর্কের জীবের ক্ষেত্রে কম। স্তন্যপায়ী প্রাণীর (যেমন কুকুর ও বেড়ালের মধ্যে) নিজেদের মধ্যেকার সাদৃশ্যের তুলনায় পাখিদের সাথে তাদের অঙ্গসংস্থানীয় সাদৃশ্য কম দেখা যায়; মাছের সাথে যা আরও কম। অঙ্গসংস্থানীয় সাদৃশ্যগুলো শুধুমাত্র বিবর্তনের আলামত হিসেবে নয়, জীবের বিবর্তনীয় ইতিহাস পঠনেও বিজ্ঞানীদের সাহায্য করে থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বসবাসকারী এবং ভিন্নধারার জীবনযাপনের পরও কচ্ছপ, পাখি, ঘোড়া, বাদুড়, মানুষ এবং তিমির কঙ্কালের মধ্যে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য রয়েছে। সাদৃশ্য দেখা যায় এসব প্রাণীর পাজরের একেকটি হাড়ে। এ বিষয়টিকে যদি আমরা একজন নকশাকারী অথবা প্রকৌশলীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করি তবে একই রকম হাড় দিয়ে অনুরূপ কাঠামোর বাহু ব্যবহার করে একটি কচ্ছপ কিংবা তিমির সাঁতার কাটা, কুকুরের দৌড়ানো, মানুষের লেখালেখি করা, পাখি ও বাদুড়ের আকাশে উড়াকে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। আমাদের বিবেচনায় একজন প্রকৌশলী প্রতিটি কাজের জন্য বাহুর গঠন-কাঠামোর আরো উপযোগী ডিজাইন করতে পারবেন। কিন্তু আমরা যদি স্বীকার করি এই প্রাণীগুলো একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে তাদের কঙ্কালের কাঠামো জন্মগতভাবে পেয়েছে যেগুলো তাদের জীবন ধারণের ধারাবাহিকতায় আলাদা আলাদা পথে চলে যাওয়ায় কিছুটা পরিবর্তিত কাজে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে তাহলে এই প্রাণীদের কঙ্কালগুলোর মধ্যেকার সাদৃশ্যের একটি বোধগম্য উত্তর পাওয়া যাবে।

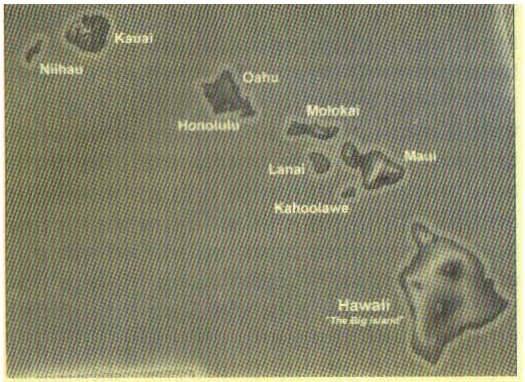

চিত্র ৪:৩ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জেগে উঠা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ নিকটবর্তী মহাদেশ থেকে প্রায় দুই হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে কাওয়াই এবং ৫ লক্ষ বছর আগে হাওয়াই নামের আগ্নেয়দ্বীপগুলো গড়ে ওঠেছে। সবগুলো দ্বীপই আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরণের ফলে গড়ে ওঠেছে। বর্তমানে কিলাওয়া নামের আগ্নেয়গিরিটি কেবল সক্রিয় রয়েছে। আগ্নেয়গিরিটি হাওয়াইয়ের দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। এই দ্বীপগুলো উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় টেকটোনিক প্লেটের উপর অবস্থিত। হিসেব করে দেখা গেছে এরা প্রতি বছরে উত্তর-পশ্চিমে দুই ইঞ্চি করে সরে যাচ্ছে। এভাবে প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে কাওয়াই দ্বীপ গড়ে ওঠেছিল বর্তমানে সেখানে কিলাওয়া আগ্নেয়গিরিটি কেবল সক্রিয় রয়েছে। সবচেয়ে প্রাচীন দ্বীপগুলোতে প্রথমে পাখি ও উদ্ভিদের বসবাস শুরু হয় মহাদেশীয় ভূ-খণ্ড থেকে। বাতাস, সমুদ্রে ভাসমান কাঠের গুঁড়ি, এবং অন্যান্য মাধ্যমে এই জীবগুলো এবং উদ্ভিদের বীজ দ্বীপপুঞ্জে পৌছেছিল। নতুন দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দা বেশিরভাগ জীবই পুরাতন দ্বীপপুঞ্জ থেকে এসে উপনিবেশ গড়েছে।

বিজ্ঞানীরা প্রথম দিকে জীববিবর্তন সংক্রান্ত প্রমাণ পেয়েছিলেন ভ্রূণবিজ্ঞান থেকে। ভ্রূণবিজ্ঞানে ডিম্বকের ভেতর ভ্রূণের প্রাথমিক পর্যায় থেকে তা ভূমিষ্ট হবার আগ পর্যন্ত প্রাণীর বিকাশ নিয়ে

অনুসন্ধান করা হয়। বিজ্ঞানীরা মাছ, সরীসৃপ, পাখি এবং মানুষের ভ্রূণগত বিকাশের প্রক্রিয়ায় অসাধারণ মিল দেখতে পান এবং এই মিল বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমে ভিন্ন থেকে ভিন্নতর হতে থাকে। দূরবর্তী সম্পর্কের প্রাণীদের (যেমন মানুষ ও হাঙর) তুলনায় নিকট সম্পর্কের প্রাণীদের (যেমন মানুষ ও বানর) মধ্যে এই মিল দীর্ঘস্থায়ী হয়। আমরা তো জানি মাছের ফুলকাছিদ্র রয়েছে। কিন্তু মানুষের ভ্রূণেও ফুলকাছিদ্র দেখা যায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণে ফুলকাছিদ্রগুলো দেখা যায়। এই ফুলকা দিয়ে প্রাণীরা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ না করলেও তাদের আদিম পূর্বপুরুষেরা যে মাছ ছিল সেই চিহ্নই ফুটে ওঠে। প্রাণীদের ভ্রূণের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে যে অদ্ভুত গঠন পরিলক্ষিত হয় এবং সেটা আবার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই পরিবর্তিত হয়ে যায় জীববিবর্তন তত্ত্ব থেকেই তার ব্যাখ্যা মেলে।

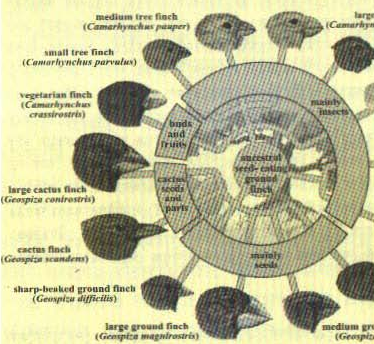

চিত্র ৪:৪ ডারউইনের ফিঞ্চ পাখি। গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত ১৪ প্রজাতির ফিঞ্চ পাখি। প্রতিটি প্রজাতি তাদের ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যাভাসের বিপরীতে ঠোঁটের আকারও ভিন্নরূপে বিবর্তিত হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল থেকে ৬০০ মাইল দূরে বিষুবরেখার উপর গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মতো এগুলোও আগ্নেয়দ্বীপ। বিগত ৪৫ লক্ষ বছর ধরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এগুলো গঠিত হয়েছে। প্রায় ৩০ লক্ষ বছর আগে ফিঞ্চের একটি প্রজাতি দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ থেকে এসে এই দ্বীপে বসতি স্থাপন করে। নতুন পরিবেশের উপযোগী বাস্তসংস্থানের ফলে দ্রুত ফিঞ্চ পাখির অন্যান্য প্রজাতির উদ্ভব ঘটে।

নাম	প্রজাতির সংখ্যা	রোগাক্রান্ত প্রজাতির হার
ফার্নগাছ	১৬৮	৬৫
পুষ্পময় উদ্ভিদ	১,৭২৯	৯৪
শামুক	১,০৬৪	৯৯+
ড্রসোফিলা ফলের মাছি	৫১০	১০০
অন্যান্য কীটপতঙ্গ	৩,৭৫০	৯৯+
স্থলচর স্তন্যপায়ী	০	০

টেবিল ৪:১ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে উদ্ভিদ ও প্রাণীর একাধিক স্থানীয় প্রজাতি রয়েছে, যেগুলো সাধারণত ভূখণ্ডের অন্যান্য অংশে দেখা যায় না। টেবিলের ডান পাশের কলামে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে প্রাকৃতিকভাবে রোগাক্রান্তের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতির হার উল্লেখ করা হয়েছে। জীবজগতের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি এই দ্বীপপুঞ্জে পৌছায়নি ফলে বংশবিস্তারও করতে পারেনি। সাম্প্রতিক সময়ে মানুষ কিছু প্রাণীকে (যেমন স্তন্যপায়ী) সাথে করে নিয়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে নিয়ে বসতি স্থাপন করিয়েছে। ফলে যেসব প্রজাতি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে বসতি স্থাপন করতে পেরেছে তাদের মধ্যে প্রতিযোগী কম থাকায় এই অঞ্চলে অত্যধিক সংখ্যায় জীববৈচিত্র্য বিকশিত হয়েছে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভৌগলিক অবস্থানের মধ্যেও ডারউইন বিবর্তনের আলামত খুঁজে পেয়েছেন। যেমন তিনি দেখেছেন গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপে একাধিক ধরনের কচ্ছপ ও ফিঞ্চ পাখি রয়েছে সেগুলো আবার দক্ষিণ আমেরিকায় বসবাসকারীদের তুলনায় আলাদা। সারা বিশ্বে ড্রসোফিলা (Drosophila) নামের ফলের মাছিদের প্রায় ১৫০০ প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ বাস করে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। এই

দ্বীপপুঞ্জের আয়তন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের পাঁচ ভাগেরও কম। এছাড়াও হাওয়াই দ্বীপে কচ্ছপের প্রায় এক হাজার প্রজাতি রয়েছে যাদের আর অন্য কোথাও দেখা যায় না। অপরদিকে এই দ্বীপপুঞ্জে কোনো স্থানীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী নেই। দুনিয়ার অন্যান্য অংশের কীটপতঙ্গের প্রজাতির বেশিরভাগেরই কোনো অস্তিত্ব নেই সেখানে। হাওয়াই ও গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের এই জীববৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা জীববিবর্তন তত্ত্ব থেকেই মেলে। হাওয়াই এবং গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ আমাদের মূল ভূখণ্ড থেকে একেবারে আলাদা। খুব কম সংখ্যক প্রাণীই সেখানে পৌছে উপনিবেশ স্থাপন করতে পেরেছে। যে প্রজাতিগুলো এই দ্বীপগুলোতে আবাস গেড়েছে তাদের লতাপতা-গুল্ম, ফলের বীজ জাতীয় খাদ্যের অভাব হয়নি। বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ এবং আবহাওয়া জীবন ধারণের জন্য উপযোগী ছিল। ফলে প্রজাতির বিবর্তনও দ্রুত হয়েছে এই দ্বীপপুঞ্জে। হাওয়াই এবং গ্যালাপাগোস উভয় জায়গায় কোন স্থানীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী নেই। কারণ স্তন্যপ্রায়ী প্রাণীদের পক্ষে দুর্গম সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে এই দ্বীপপুঞ্জে পৌছাবার কোনো সুযোগ ছিল না। ফলে ওই দ্বীপে শেয়াল-কুকুর-হায়েনার মতো শিকারি প্রাণীরও আবির্ভাব ঘটেনি।

'*অরিজিন অব স্পিসিজ*' প্রকাশের একশ বছর পর, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'আণবিক জীববিজ্ঞান' নামের জীববিজ্ঞানের নতুন একটি শাখার উদ্ভব ঘটেছে যা আজকের যুগে জীববিবর্তনের পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থাপন করে। বিজ্ঞানের এই শাখা জীববিবর্তনকে দুইভাবে প্রমাণ করে। প্রথমত এটা ডিএনএ'র প্রকৃতির মধ্যে জীবনের ঐক্য এবং এনজাইম ও প্রোটিনের মতো আণবিক জগতের জৈবিক কার্যাবলীতে (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়ত জীববিজ্ঞানের এই শাখা প্রাণীজগতের বিবর্তনীয় ইতিহাসকে পুনর্গঠন করতে পেরেছে যেগুলো পূর্বে বিজ্ঞানীদের অজানা ছিল এবং বর্তমানে সকল জীবিত জীবের বিবর্তনীয় সম্পর্ককে সংশোধনসহ নিশ্চিত করতে পেরেছে।

ডিএনএ এবং প্রোটিনকে 'তথ্যপূর্ণ বৃহদাকার অণু' বলা হয়ে থাকে। কেননা এরা একক নিউক্লিওটাইড এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রম দিয়ে গঠিত দীর্ঘ সরলরৈখিক অণু। এদের প্রতিটি ক্রমান্বয়িক উপাদানে ওই জীবের বিবর্তনীয় তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে, যেভাবে বর্ণমালার বর্ণের ক্রম থেকে একটি 'অর্থবাচক শব্দ' তৈরি হয়। এই দুটো বৃহৎ অণুর মধ্যেকার উপাদানগুলোর অনুক্রমকে পরস্পরের সাথে তুলনা করে তাদের মধ্যে কতগুলো এককে ভিন্নতা রয়েছে তাও চিহ্নিত করা যায়। কারণ বিজ্ঞানীরা জানেন প্রতিবার এক 'একক' করে পরিবর্তনের ফলে বিবর্তন ঘটে থাকে, তাই এককের ভিন্নতার সংখ্যা এদের অভিন্ন পূর্বপুরুষের উপস্থিতি নির্দেশ করে। এভাবে প্রত্নজীববিদ্যা, জৈবভূগোল, তুলনামূলক শারীরবিদ্যা এবং বিবর্তনীয় ইতিহাসকে অধ্যয়নকারী অন্য অনুষদগুলো থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলোকে বর্তমানে জীবিত জীবগুলোর ডিএনএ ও প্রোটিনের আণবিক পাঠ (নিউক্লিওটাইড ও অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমগুলোকে তুলনামূলক পরীক্ষণের মাধ্যমে) থেকে যাচাই করা হয়। আণবিক জীববিজ্ঞানে কেবল জীবিত প্রজাতির উপরই অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা হয়। প্রাচীন যুগে বসবাসকারী জীবের ফসিল থেকে ডিএনএ এবং প্রোটিন উদ্ধার করা এবং সেগুলোর অনুক্রম বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য এবং বলতে গেলে খুবই দুর্লভ একটি কাজ। বেশিরভাগ ফসিলের নমুনা থেকে ডিএনএ ও অন্যান্য জৈবঅণু যোগাড় করা যায় না। কারণ এগুলো ইতোমধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন পর্যন্ত আণবিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষিত সবচেয়ে প্রাচীন ফসিলগুলোর বয়স মাত্র কয়েক হাজার থেকে ৬০ হাজার বছর পর্যন্ত। এর মধ্যে রয়েছে মিসরীয় মমি, ম্যামথ এবং নিয়েনডার্থাল প্রজাতির কিছু অবশেষ। এরপরও বলা যায় আণবিক জীববিজ্ঞান আমাদের প্রাচীন বিবর্তনীয় সম্পর্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, (বিলুপ্ত প্রাণীগুলো ব্যতীত) নির্দিষ্ট সংখ্যক জীবিত প্রজাতির মধ্যে থেকে কোন প্রজাতিটি সবচেয়ে আদিম, তাদের বিবর্তনীয় ইতিহাস কিরকম

সেগুলো নির্ণয় করতে পেরেছে। জীববিবর্তনকে প্রমাণ করার জন্য এগুলো অবশ্যই অসামান্য একেকটি কাজ।

তুলনামূলক শারীরবিদ্যা এবং জীববিজ্ঞানের অন্যান্য ধ্রুপদী শাখাগুলো থেকে আণবিক জীববিজ্ঞান গবেষণার তিনটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছে। এগুলো হলো পুঙ্খানুপুঙ্খতা, বিশ্বজনীনতা এবং ভিন্নরূপতা। প্রথমত জীববিজ্ঞানের এই শাখায় তথ্য-উপাত্তকে তাৎক্ষণিকভাবে পরিমাপ করা যায়। বিভিন্ন জীবের একই জৈবঅণুগুলোর এককের অনুক্রম জানা থাকলে এদের ভিন্ন এককের সংখ্যাও সহজে বের করা যায়। এটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির নিউক্লিওটাইড ও অ্যামিনো অ্যাসিডকে সারিবদ্ধ করে তাদের পার্থক্যগুলো গণনা করার একটি সাধারণ পদ্ধতি। দ্বিতীয়ত সুবিধা হচ্ছে বিশ্বজনীনতা। অর্থাৎ একেবারে ভিন্ন ধরনের একাধিক জীবেরও মধ্যের জৈব-অণু নিয়ে এই তুলনা করা যেতে পারে। যেমন ইস্ট, পাইন গাছ এবং মানুষের মধ্যেকার তুলনা সম্পর্কে শারীরবিজ্ঞান কিংবা প্রত্নজীববিজ্ঞান খুবই কম তথ্য দিতে পারে। কিন্তু আণবিক জীববিজ্ঞানে এই জীবগুলোর অসংখ্য ডিএন এবং প্রোটিনের অনুক্রমকে তুলনা করার সুযোগ রয়েছে। আণবিক জীববিজ্ঞানের তৃতীয় সুবিধা হচ্ছে ভিন্নরূপতা। প্রতিটি জীবেই প্রচুর জিন এবং প্রোটিন রয়েছে যাদের প্রত্যেকটি একই বিবর্তনীয় ইতিহাসকে তুলে ধরে। যদি একটি নির্দিষ্ট জিন অথবা প্রোটিন পরীক্ষণের ফলাফল থেকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রজাতির বিবর্তনীয় সম্পর্ক নিয়ে সন্তোষজনক ফলাফল না পাওয়া যায় তাহলে বিষয়টি সমাধানের আগ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জীবের অন্যান্য জিন এবং প্রোটিনকে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

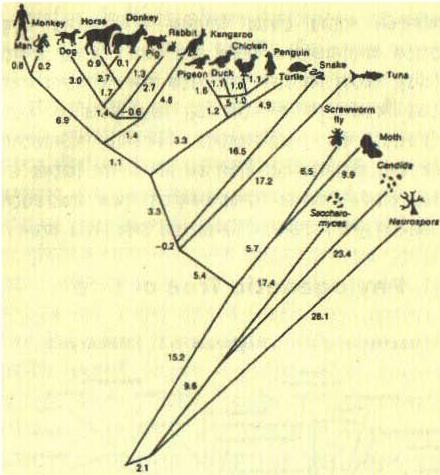

চিত্র ৪:৫ চিত্রে সাইটোক্রোম সি'র অ্যামিনো অ্যাসিডের অনুক্রমের উপর নির্ভর করে বিশটি প্রজাতির বিবর্তনীয় ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি এই বিবর্তন-বৃক্ষে প্রজাতিগুলোর মধ্যকার অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্থক্যের সংখ্যাকে উল্লেখ করা হয়েছে। সকল প্রাণীর সাধারণ পূর্বপুরুষ (চিত্রের একেবারে নিচে) এবং ইস্ট একশত কোটি বছর আগে বাস করতো। আজ থেকে প্রায় ৫০ কোটি বছর পূর্বে পোকামাকড় এবং মেরুদণ্ডীরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে এটা ঠিক ১৯৬৭ সালে তৈরি এই বিবর্তন-বৃক্ষের সব তথ্য সঠিক নয়। পরবর্তীতে অনেক তথ্য সংশোধিত হয়েছে। যে বিষয়টি এখানে বিস্ময়কর তা হলো একটি মাত্র ক্ষুদ্র প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্থক্য থেকে প্রজাতিগুলোর বিচ্ছিন্নতার সময়কাল প্রায় নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়। বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত প্রায় সব ধরনের উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অণুজীবদের মধ্যেকার হাজারো আণবিক বিবর্তনের সম্পর্ক পরীক্ষা করেছেন। চিত্রের বিবর্তন-বৃক্ষের প্রশাখাগুলো বরাবর সংখ্যাগুলো কম্পিউটার দ্বারা হিসাবকৃত সাইটোক্রোম সি-এর নিউক্লিওটাইডের পরিবর্তন নির্দেশ করে। (দ্রষ্টব্য: Walter M. Fitch and Emanuel Margoliash, "Construction of Phylogenetic Trees," *Science* 155, 279-284, 1967)

জীববিবর্তন পাঠের ক্ষেত্রে আণবিক জীববিজ্ঞানের বহুমুখী উপায়গুলোকে অন্যান্যভাবেও উল্লেখ করা যায়। বিভিন্ন প্রকারের জিনের বিভিন্ন ধরনের বিবর্তনের হার থেকে জিন পরীক্ষণের মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তন-বৃক্ষ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রাচীনকালের বিবর্তনীয় ঘটনাগুলোকে পুনর্গঠনের জন্য জীববিজ্ঞানীরা ধীরগতির বিবর্তনশীল জিনের উপর নির্ভর করে থাকেন। আবার সাম্প্রতিককালে পৃথক প্রজাতিগুলোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা দ্রুত বিবর্তনশীল জিনগুলোর উপর নির্ভর করেন।

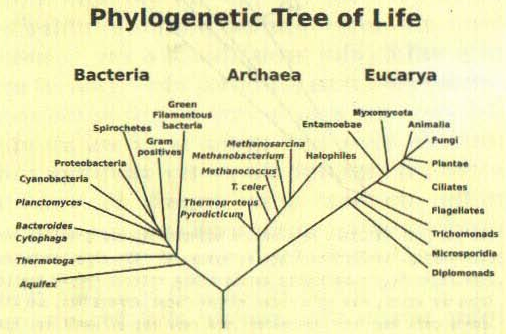

চিত্র ৪:৬ বিশ্বজনীন জীবনবৃক্ষকে পুনর্গঠিত করা সম্ভব হয়েছে rRNA (ribosomal ribonucleic acid) জিন বিশ্লেষণ করে। চিত্রে সর্বশেষ বিশ্বজনীন সাধারণ পূর্বপুরুষ একেবারে নিচে অবস্থিত। প্রশাখাগুলো বিভিন্ন জীবকে নির্দেশ করে। জীবজগৎ তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত; ব্যাকটেরিয়া, আর্কিয়া এবং ইউক্যারিয়া। ব্যাকটেরিয়া, আর্কিয়া এবং বেশিরভাগ ইউক্যারিয়া আবার আণুবীক্ষণিক জীব। উদ্ভিদ, প্রাণী এবং ছত্রাক ইউক্যারিয়াদের বহুকোষী শাখা। (দ্রষ্টব্য: Carl R. Woese, "Interpreting the universal phylogenetic tree," *Proceedings of the National Academy of Sciences* USA 97, 8392–8396, 2000)

আণবিক জীববিজ্ঞানের বিশাল উন্মেষের পর এই মুহূর্তে একটি দৃঢ় উক্তি প্রদান করা সম্ভব যা ডারউইন বেঁচে থাকলে অবশ্যই তাঁকে উল্লসিত করে তুলতো এবং আণবিক জীববিদ্যা সম্পর্কে বর্তমানে অজ্ঞাতদেরও বিস্মিত করে তুলবে। আমাদের সময়ে জীবিত জীবদের বিবর্তনীয় ইতিহাস লিপিবদ্ধকরণে এখন আর কোনো শূন্যস্থান নেই। আণবিক জীববিদ্যা ইতোমধ্যে আমাদের 'বিশ্বজনীন প্রাণবৃক্ষ' অত্যন্ত সফলভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। প্রাণের আদি উৎস থেকে ধারাবাহিক পরম্পরা, আদি পূর্বপুরুষ থেকে সকল জীবিত প্রাণীকে, এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল প্রজাতির ক্রমকেও পুনর্গঠনে সক্ষম হয়েছে। প্রতিমাসে একের পর এক বৈজ্ঞানিক জার্নালে বিশ্বজনীন প্রাণবৃক্ষের নানা প্রশাখা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে। জীবিত জীব সকলের ডিএনএ অনুক্রমে অবস্থিত প্রায় অসীমসংখ্যক বিবর্তনীয় তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে জীববিজ্ঞানীরা আজকের যুগের প্রায় সকল জীবের মধ্যেকার বিবর্তনীয় সম্পর্কগুলো বিস্তারিতভাবে পুনর্গঠন করতে পেরেছেন। এখন যা প্রয়োজন তা হচ্ছে শুধু বিবর্তন সংক্রান্ত যে-কোনো প্রশ্নের যতটুকু সম্ভব উত্তর জানতে প্রয়োজনীয় খাতে পর্যাপ্ত সময় প্রদান এবং গবেষণার জন্য অর্থবরাদ্দ দেয়া।

অতএব নির্দ্বিধায় বলা যায় প্রজননশীল এবং মিউটেন্ট জীবদের বিবর্তন প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়াতেই ঘটে। তবে আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রশ্ন হচ্ছে এই পৃথিবীতে জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল কিভাবে? অন্য গ্রহগুলোতে কি প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে? পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়গুলোর উপর অনুসন্ধান চালাবো। আসলে আমরা কতটুকু জানি এবং কি জানি না তা নির্দিষ্ট করে দেখবো, জীবনের উদ্ভব সম্পর্কে জানার জন্য এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

জীবনের সূত্রপাত হলো কিভাবে?

অধিকাংশ জীববিজ্ঞানীই এই বিষয়ে এখন একমত যে আমাদের পৃথিবীতে কোটি কোটি বছর আগে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবনের সূত্রপাত ঘটেছে। আর এটি হয়েছে কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের মতো সেই একই রাসায়নিক পদার্থগুলো দ্বারা, যেগুলো আজকের যুগের জীবদেহেও রয়েছে। বিজ্ঞানীরা আরো একমত পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল জীবই জীবনের একই উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানেন, তার মানে কী পৃথিবীতে জীবনের সূত্রপাত কিভাবে হয়েছে, এর সবকিছুই আমরা জেনে ফেলেছি? আসলে পুরোপুরি তা নয়। যদিও প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে বেশ কিছু ভাল ধারণা এবং পরীক্ষণযোগ্য ব্যাখ্যা রয়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে, তবু আজ অবধি এ বিষয়ে আমাদের পক্ষে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে এখনো পৌঁছানো যায়নি। বিজ্ঞানীরা বিপুল পরিমাণ প্রমাণ সংগ্রহ করে জানতে পেরেছেন পৃথিবীর প্রতিটি জীবই একই সাধারণ উৎস থেকে ক্রমবিকশিত হয়েছে। আমরা এই প্রশ্ন নিয়ে পরবর্তীতে কিছুটা আলোকপাত করবো। এখন দেখা যাক, প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দানের পথে প্রধান বাধাগুলো কী কী।

প্রথমে আমরা যে প্রশ্নটি দিয়ে শুরু করতে পারি তা হল জীবন কি? সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চাইতে একটু অন্যভাবে এই বিষয়ে আলোকপাত করি। আমরা জীবন বলতে যা বুঝি, দেখা যায় তার আসলে দুটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি হলো বংশগতি এবং অন্যটি বিপাকক্রিয়া। আমরা তো এটাও জানি কোষ নিজেদের প্রতিলিপি তৈরি করবার মাধ্যমে বংশবিস্তার ঘটায়। নতুন

উৎপন্ন কোষগুলো তার মাতৃকোষের গঠনকারী অভিন্ন উপাদানগুলো বহন করে থাকে, তাই জীবনের ধারাবাহিকতাও বজায় থাকে। এই অভিন্ন উপাদানগুলো আসলে কী। এগুলো হচ্ছে কোষের মধ্যেকার উপাদান, যাকে বলা যায় রাসায়নিক 'যন্ত্রপাতি', এদেরকে পরিচালনা করার জন্য রয়েছে নির্দেশনাবলী। কোষে নতুন কোনো রাসায়নিক উপাদান তৈরি হবে এবং সেটা কিভাবে কাজ করবে–এ জাতীয় তথ্যাবলী আবার এদের নিজেদের রাসায়নিক পদার্থগুলোর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে।

এই 'নির্দেশক' রাসায়নিক উপাদানগুলোর সংশ্লেষণের জন্য কোষের মধ্যে রাসায়নিক 'যন্ত্রের' প্রয়োজন। এখানে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এরকম, জীবকোষের মধ্যে রাসায়নিক 'যন্ত্রের' উদ্ভব আগে ঘটেছে নাকি নির্দেশনাগুলোর উদ্ভব আগে ঘটেছে? এই প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে আমরা 'ডিম আগে না মুরগি আগে' নামক একটি বহুল প্রচারিত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি। আমরা তো জানি নির্দেশনাগুলো রাসায়নিক যন্ত্রাদি কিভাবে কাজ করবে তা বলে দেয়, কিন্তু রাসায়নিক যন্ত্রাদি ছাড়া নির্দেশনাগুলোর সংশ্লেষণও সম্ভব নয়। ধরা যাক একটি নথির অনুলিপি তৈরি করতে হবে। এ জন্য আমাদের একটি ফটোকপি মেশিনের প্রয়োজন। অথবা একটা কম্পিউটারের কথা ভাবি। কম্পিউটারের পরিচালনাসংক্রান্ত নির্দেশনাগুলো বহন করার জন্য হার্ডওয়্যারের প্রয়োজন আর সফটওয়্যারের প্রয়োজন রয়েছে নির্দেশনাগুলো পরিচালিত হবার জন্য। কিন্তু বাস্তব জীবনে কম্পিউটার তৈরির নির্দেশনাগুলো সফটওয়্যার বহন করে থাকে।

জীবকোষে ডিএনএ (ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড) এবং আরএনএ (রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড) অণু হলো তথ্যবহনকারী গাঠনিক-উপাদান। ডিএনএ আর আরএনএ'র তন্তুগুলো চার ধরনের রাসায়নিক উপাদান দ্বারা গঠিত হয়েছে। যেমন ডিএনএ'তে রয়েছে A, T, C, G আর আরএনএ-তে A, C, G, U। মানে আরএনতে শুধু T'র বদলে রয়েছে U, আর বাকি সব উপাদান একই। আমাদের

বংশগতির তথ্যগুলো এই চারটি উপাদানের ক্রমগুলোর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। ঠিক যেভাবে ইংরেজি বর্ণমালা থেকে একাধিক বর্ণের নির্দিষ্ট ক্রম সাজিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট 'অর্থবোধক শব্দ' পাওয়া যায়। কোষের মধ্যেকার যে যন্ত্রগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়া (বিপাকক্রিয়া) ঘটায় তাদের মধ্যে 'এনজাইম' (উৎসেচক) রয়েছে। এনজাইমগুলো মূলত এক ধরনের প্রোটিন। এরা প্রায় নিখুঁতভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে পারে। এবং সত্যি বলতে মনুষ্য-সৃষ্ট যে কোনো যন্ত্রের চেয়েও দ্রুত গতিতে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ফেলতে পারে। আবার প্রোটিন হচ্ছে বিশটি বিভিন্ন রকম অ্যামিনো অ্যাসিডের সম্ভাব্য সমন্বয়ে বিন্যস্ত জটিল জৈব যৌগ।

একটি জীবকোষে অনেক ধরনের উপাদান আছে, যেমন রয়েছে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম। এগুলো অত্যন্ত 'দক্ষতা' ও 'নৈপুণ্যের' সাথে অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া পরিচালনা করে। এই এনজাইমগুলোর অনেকে আবার রাসায়নিক বিক্রিয়ার ধাপগুলো সঠিকভাবে নির্ধারণ করে দেয়। কোষের অভ্যন্তরীণ এই রাসায়নিক কার্যক্রমকে চিত্রের সাথে তুলে ধরতে চাইলে তা অত্যন্ত জটিল এবং বৃহৎ জালের মতোই দেখায়। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্রকে যেভাবে দেখা যাবে। আমেরিকাতে রয়েছে আন্তঃপ্রদেশীয় এবং প্রাদেশিক সড়ক-মহাসড়ক, সব ধরনের আনুষাঙ্গিক সড়ক, বিকল্প সড়ক, ড্রাইভওয়ে ও সংযোগ সড়ক। এদের সাথে আরও যোগ হবে তেলের খনি, তেল শোধনাগার ও গ্যাস-স্টেশন, মোটরগাড়ি, ট্রাক, মোটরসাইকেল ও অন্যান্য যানবাহন এবং কারখানাগুলো যেখানে এগুলো তৈরি করা হয়। আরও রয়েছে নদী, জলপথ, সমুদ্রবন্দর এবং সব ধরনের নৌকা ও বিমানবন্দর, আকাশপথ, উড়োজাহাজ এবং এদের নির্মাণকারী কারখানা। আমেরিকার অত্যন্ত জটিল এই যোগাযোগব্যবস্থা নিঃসন্দেহে কোষের অভ্যন্তরীণ রাসায়নিক উপাদান ও প্রক্রিয়াগুলোর বিস্তীর্ণ জালিকা থেকে বেশি জটিল নয়।

এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগব্যবস্থার সূত্রপাত কিভাবে ঘটলো, এই প্রশ্নটির উত্তর চিন্তা করুন। সম্ভবত আমরা প্রথমে চিন্তা করবো গ্রামের সাধারণ মেঠোপথের কথা, যেগুলো পরবর্তীতে পশু ও মালবাহী গাড়ি চলাচলে উপযোগী কাঁচাপাকা রাস্তায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু আজকের যুগে এটা হয়তো নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন হবে সর্বপ্রথম মেঠোপথগুলো কোথায় তৈরি হয়েছিল, কোন কোন গ্রাম বা শহরগুলোকে এগুলো সংযুক্ত করেছিল এবং এদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো কি ছিল? আমরা এটা জানি উত্তর আমেরিকার প্রথমদিকের মেঠোপথগুলো তৈরি হয়েছিল কয়েক হাজার বছর পূর্বে। অপরদিকে পৃথিবীতে জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল হাজার মিলিয়ন বছর পূর্বে। সুতরাং কিভাবে জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল তা নির্ধারণ করা আরো অনেক বেশি কঠিন কাজ।

জীবনের উদ্ভব কিভাবে হলো তা বুঝতে গেলে আমাদেরকে প্রথমে সরল প্রাণের গঠনকারী আদিম উপাদানগুলোকে শনাক্ত করতে হবে। আগে যেমনটা বলা হয়েছে এক্ষেত্রে আমাদের 'ডিম আগে না মুরগি আগে' নামক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। আমাদের প্রয়োজন ডিএনএ-আরএনএ'র মতো তথ্যবহনকারী অণু, যেগুলো কোন এনজাইমকে সংশ্লেষ করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে সে 'তথ্য' মাতৃকোষ থেকে ভূমিষ্টকোষে বহন করে নিয়ে যায়। কিন্তু এই ডিএনএ বা আরএনএ অণুগুলোকে সংশ্লেষণের প্রয়োজন। যার জন্য আমাদের প্রয়োজন বিপাকক্রিয়া এবং জীবন্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

কম্পিউটারের উদাহরণে আবার ফিরে যাওয়া যাক। বাস্তবে একটি কম্পিউটার তৈরির নির্দেশনা সফটওয়্যারের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে, কিন্তু এই সফটওয়্যার (ধরে নিলাম 'বংশগতির উপাদান') আবার কম্পিউটার (ধরে নিলাম 'বিপাকক্রিয়া পরিচালনকারী যন্ত্র') ছাড়া পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই একবার কম্পিউটার অস্তি

ত্বশীল হয়ে গেলে আর কোনো সমস্যা থাকে না। সমস্যাটা হলো প্রথম কম্পিউটারটিকে কিভাবে পাওয়া যাবে।

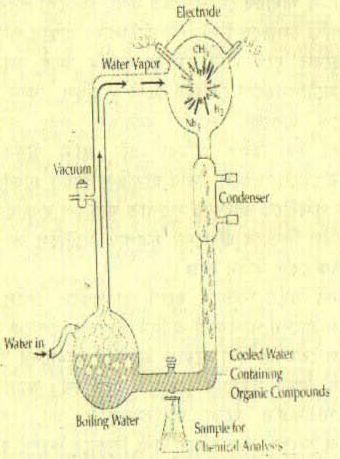

চিত্র ৫:১ প্রাণের উৎস নিয়ে স্ট্যানলি মিলারের গবেষণার চিত্র

১৯৫৩ সালে শিকাগো ইউনিভার্সিটির রসায়ন বিভাগের স্নাতকবর্ষীয় ছাত্র স্ট্যানলি মিলার একটি বায়ুনিরোধক কাঁচের পাত্রে পৃথিবীর জন্মলগ্নের পরবর্তী সময়কার অনুরূপ একটি কৃত্রিম পরিস্থিতির অবতারণা করেন। তিনি এতে কিছু অজৈব যৌগ যেমন, অ্যামোনিয়া, মিথেন, হাইড্রোজেন গ্যাস ও জলীয়বাষ্প যোগ করেন এবং বিদ্যুৎ স্ফরণের মাধ্যমে বজ্রবিদ্যুতের সৃষ্টি করেন। এক সপ্তাহ পর প্রাকৃতিকভাবে একমাত্র জীবদেহে প্রাপ্ত অ্যামিনো অ্যাসিড এবং ইউরিয়ার মতো উপাদান এই পরীক্ষাসম্পন্নকারী ৫ লিটারের

কাঁচপাত্রে পাওয়া গেল। এ থেকে মিলার দাবি করলেন এনজাইমের প্রভাব ছাড়াই জৈব-যৌগ তৈরি হতে পারে। আদিম পৃথিবীর সাথে আরো সাদৃশ্যপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করে চালানো পরবর্তী পরীক্ষাগুলো নিশ্চিত করেছে যে, সাধারণ জৈব-যৌগসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হতে পারে। অসংখ্য পরীক্ষার পর এই সম্ভাবনাটি বর্তমানে স্বীকৃত হয়েছে। এর পিছনে আরও কারণ হলো পৃথিবীতে আঘাতকারী উল্কাপিণ্ড, ধূমকেতু এবং মহাজাগতিক ধূলিমেঘেও এই সাধারণ জৈব-যৌগগুলোর অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে।

যে প্রশ্নটি রয়ে গেল তা হল, এই গঠনকারী উপাদানগুলো কিভাবে একত্রিত হয়ে এনজাইম, ডিএনএ, সজীবকোষের মতো আরো জটিলতর অণুতে পরিণত হলো। একটি সুবিধাজনক চিত্রকল্প হলো যে, পৃথিবী যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়ে মহাসাগর সৃষ্টি হবার উপযোগী হয়ে উঠে। মিলার এবং অন্যান্যদের পরীক্ষায় জৈব-অণুর এক ধরনের স্যুপ (আদিম স্যুপ) তৈরি হয়। একে যদি যথেষ্ট সময় প্রদান করা হয় (মিলিয়ন বছর সময় হাতে ছিল), তাহলে অণুদের কিছু নির্দিষ্ট সংযোগ সৃষ্টি হবে। এদের অনেকগুলো আবার অন্যদের তুলনায় বেশিদিন টিকে থাকতে সফল হবে। এর ফলে স্বীয় প্রতিলিপিকরণে সক্ষম কিছু গঠনের সৃষ্টি হবে যাদের থেকে জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল বলে আজ আমরা জানি।

ডিম এবং মুরগির সমস্যাটি এখনও রয়ে গেল। জীবনের ধারাবাহিকতা অর্থাৎ বংশগতির উপাদানসমূহ যেগুলো এনজাইমের সংশ্লেষণ নির্দেশনার মাধ্যমে প্রাণ ধারণের প্রক্রিয়াগুলোকে পরিচালনা করে, এনজাইম সৃষ্টির পূর্বে এদেরকে আমরা কিভাবে পেলাম। ১৯৮০ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটলো যখন থমাস আর. চেক এবং সিডনি আল্টম্যান পৃথকভাবে আবিষ্কার করলেন, কিছু আরএনএ-অণুর রাসায়নিক বিক্রিয়া অনুঘটনের সক্ষমতা রয়েছে যারা আবার নিজেদের সংশ্লেষণ ঘটাতেও সক্ষম। এ আবিষ্কারের জন্য তাঁরা ১৯৮৯ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। আবিষ্কারটি 'ডিম ও

মুরগি'র সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এখান থেকে জানা গেছে, আরএনএ অণুগুলো রাইবোসোমে পরিবর্তিত হয়ে বংশগতি এবং বিপাকক্রিয়া উভয়ই সম্পন্ন করতে পারে যেগুলো কিনা মূলত দুটি ভিন্ন অণু ডিএনএ ও প্রোটিন দ্বারা বর্তমানকালের জীবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। অনেক বিজ্ঞানীই এখন বিশ্বাস করেন, প্রাণ একটি আরএনএ-প্রভাবাধীন সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে যাকে 'আরএনএ-বিশ্ব' বলা হয়ে থাকে। এটি বর্তমান ডিএনএ জগতের পূর্বসূরি, যেখানে জৈবিক বংশগতি ডিএনএ অণুগুলোর মধ্যেই সর্বদা সংরক্ষিত থাকে।

আদিম পৃথিবীতে রাইবোজোমের ভূমিকা পালনকারী আরএনএ অণুগুলো কিভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত হয়ে আরএনএ জগতের জন্ম দিয়েছে তা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে জোর গবেষণা চলছে। অন্যান্য আরএনএ-অণুগুলোর মতোই রাইবোজে ামের A, C, G, U দ্বারা নির্দেশিত চার ধরনের নিউক্লিওটাইড রয়েছে যাদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাইবোজোমের খুব সীমিত সংখ্যক নিউক্লিওটাইড রয়েছে, দুই ডজনের মতো। কিন্তু নিউক্লিওটাইডগুলোর নিজেদের গঠন আবার সরল নয়। এরা তিনটি আণুবীক্ষণিক উপাদান দ্বারা তৈরি। একটি রাইবোজ সুগার, ফসফেট এবং অন্যটি নাইট্রোজেন বেস। এই নাইট্রোজেন বেসই একমাত্র উপাদান যেটি নিউক্লিওটাইড ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। চার ধরনের নাইট্রোজেন বেস রয়েছে যেগুলো A, C, G, U নিউক্লিওটাইডগুলোকে নির্দেশ করে থাকে। বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিকসময়ে দেখিয়েছেন যে, রাইবোজ সুগার কিভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে C এবং U নাইট্রোজেন বেসের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে, যেটি সবচেয়ে 'কঠিন ধাপ' বলে বিবেচিত হয়।

আরএনএ অণুগুলো যেগুলো নিজেদের প্রতিলিপি তৈরি করে বংশবিস্তার করতে পারে, নতুন আরএন অণুগুলোর সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে এরা কিছু ক্ষেত্রে 'ভুল' করে থাকে, যাকে আমরা মিউটেশন বলে

থাকি। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে যা আরও ব্যাপক আণবিক জটিলতা তৈরির মাধ্যমে কোষের জন্ম দেয়, প্রথমে ব্যাকটেরিয়ায় প্রাপ্ত সরল কোষ এবং পরবর্তীতে প্রাণী, উদ্ভিদ এবং অন্যান্য প্রকৃতকোষী জীবের অপেক্ষাকৃত উন্নত কোষ। প্রাকৃতিক নির্বাচন হলো বংশগতির বিকল্প প্রকরণগুলোর (variant) পৃথক বংশবৃদ্ধি। আদিম কোষগুলো যখন বংশবৃদ্ধির সক্ষমতা অর্জন করলো, তাদের মধ্যে কিছু কোষ অন্যদের তুলনায় আরও নিখুঁতভাবে প্রজনন করতে লাগলো। অপেক্ষাকৃত কম নিখুঁতভাবে প্রজননকারী কোষগুলোর বিলুপ্তির বিপরীতে এই নিখুঁতভাবে প্রজননকারী কোষগুলোর বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পাবে। এর পেছনের যুক্তি হল যে, সেসব কোষ বেশি নিখুঁতভাবে প্রজনন করতে পারবে যাদের সঠিক বংশগতি রয়েছে এবং যারা আরো দক্ষভাবে বিপাকক্রিয়া ঘটায়।

সুতরাং আমরা কি জানি, কিভাবে জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল? না, আমরা জানি না। আমরা যা জানি তা হলো প্রাণের অনুপস্থিতিতে আদিম পৃথিবীর সম্ভাব্য পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জৈব-পদার্থের উদ্ভব ঘটতে পারে যাদের অনেকগুলো জীবনের মৌলিক গঠনকারী উপাদান। এদের মধ্যে রয়েছে নিউক্লিক অ্যাসিড যারা বংশগতি ধারণ করে আরো রয়েছে বিপাকক্রিয়ার জন্য দায়ী এনজাইমসমূহ। উদাহরণস্বরূপ প্রোটিনগুলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে সকল জীবন্ত প্রক্রিয়াগুলোকে সচল রাখে। প্রাণের উদ্ভব পেছনে কোন 'অলৌকিক সত্তা' প্রয়োজন হয়েছিল, এটি ভাবার এখন আর কোন কারণ নেই।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উদাহরণে আবার ফিরে যাওয়া যাক। আমরা এখন জানি, প্রথমদিকের মেঠোপথগুলো কিভাবে তৈরি হয়েছিল এবং উন্নত রাস্তাগুলো এদের থেকে কিভাবে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি না প্রথমদিকের মেঠোপথগুলো কোথায় তৈরি হয়েছিল কিংবা তারা ঠিক কিভাবে তৈরি হয়েছিল। আমরা আরো জানি পৃথিবীতে

জীবনের উদ্ভব একবারই ঘটেছিল, অথবা যদি একের অধিকবার উদ্ভব হয়ে থাকে, তবে একটি বাদে বাকি সবগুলোই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

আমরা জানি সকল জীবিত প্রাণীই একই সাধারণ উৎস থেকে বিকশিত হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে বর্তমানে বসবাসকারী প্রতিটি জীব কতগুলো অভিন্ন সাধারণ মৌলিক প্রক্রিয়াগুলোতে জীবন ধারণ করে, যেগুলো শুধুমাত্র একটি উৎস থেকেই উদ্ভব হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য আণুবীক্ষণিক জীব থেকে শুরু করে প্রাণী, উদ্ভিদ এবং ছত্রাক তথা সকল জীব কতগুলো অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর তালিকা বিশাল এবং ভিন্ন আকৃতিগঠন লাভের পরও সকল জীবেই এদের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান।

আমরা এই তালিকাটি শুরু করতে পারি সকল জীবেই বিদ্যমান বংশগতির উপাদান ডিএনএ দিয়ে। অন্যান্য নিউক্লিওটাইডের রাসায়নিক সম্ভাব্যতা থাকা সত্ত্বেও এরা সর্বদাই অভিন্ন চারটি নিউক্লিওটাইড দ্বারা গঠিত হয়। প্রতিটির জীবদেহের হাজারো সংখ্যক বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রোটিনগুলো বিশটি অ্যামিনো অ্যাসিডের দৈর্ঘ্যের প্রকরণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে সংশ্লেষিত হয়েছে। সকল প্রোটিন এবং সকল জীবে এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো অভিন্ন। যদিও প্রকৃতিতে আরো শতাধিক অ্যামিনো অ্যাসিডের অস্তিত্ব রয়েছে। যে জটিল যন্ত্রাদির মাধ্যমে বংশগতির তথ্যগুলো নিউক্লিয়াস থেকে কোষের মূল দেহে পৌছায়, তা সকল জীবের ক্ষেত্রে একই। ডিএনএতে অবস্থিত নিউক্লিওটাইডের ক্রমগুলো পূরকের ভূমিকা পালনকারী আরএনএ'র প্রতিলিপি ক্রমে পরিণত হয় (messenger RNA), যা অ্যামিনো অ্যাসিডের নির্দিষ্ট কিছু অনুক্রমে 'অনুবাদিত' হয়, যে-গুলো জীবনের প্রক্রিয়া পরিচালনকারী প্রোটিন এবং এনজাইম তৈরি করে। এই 'অনুবাদকার্যে' নির্দিষ্ট সংখ্যক আরএনএ-অণু (transfer RNA) এবং আরএনএ-প্রোটিন যৌগসমূহ (রাইবোজোম) ব্যবহৃত হয়, যেগুলো বিশ্বজনীনভাবে অভিন্ন। জিনেটিক যে শব্দভাণ্ডার ডিএনএ অনুক্রম থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড

ক্রমকে অনুবাদ করে দেয়, সেটিও বিশ্বজনীনভাবে অভিন্ন। জীবনের 'বিশ্বজনীন অভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো'কে আরও সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। জীবনের ঐক্য থেকে সকল জীবের বংশগতির ক্রমান্বয়িকতা ও একই সাধারণ উৎস থেকে উদ্ভবের প্রমাণ মেলে।

সৌরজগতে সম্ভবত পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যেখানে বর্তমানে প্রাণের অস্তিত্ব বিরাজমান। আমাদের ছায়াপথে প্রায় ১০০ বিলিয়ন নক্ষত্র রয়েছে, যাদের অনেকগুলোর নিজস্ব সৌরজগত রয়েছে। এছাড়া সমগ্র মহাবিশ্বে প্রায় ১০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে। ফলে খুব সম্ভবত মহাবিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। যদি তাপমাত্রা, রাসায়নিক মিশ্রণ এবং জীবনের জন্য উপযোগী অন্যান্য বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে তবে সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে কিছু গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে, হয়তো তারা সংখ্যায় অসংখ্য। গ্যালাক্সি, নক্ষত্র এবং গ্রহের অপরিমেয় সংখ্যা থেকে বিচার করলে তা সম্ভব বলেই মনে হয়। পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটে কারণ আমাদের গ্রহে প্রাণের উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। অনুরূপ পরিবেশে এবং অনেক যুগ পরে, অন্যান্য গ্রহেও সম্ভবত প্রাণের উদ্ভব ঘটবে।

অন্য কোথাও যদি প্রাণের অস্তিত্ব থেকে থাকে, তবে তা উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী হবে না, যা থেকে বোঝা যায় পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব স্বতন্ত্র ও অদ্বিতীয়। এমনও হতে পারে যে মৌলিক উপাদানগুলোও ভিন্ন। কার্বন ছাড়াও সিলিকন মৌলটিও হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং অন্যান্য উপাদানের সাথে যুক্ত হয়ে জীবনের প্রাথমিক উপাদানগুলো গড়ে তুলতে পারে। এমনও ঘটতে পারে যে, কয়েক দশক কিংবা কয়েক শতাব্দী পরে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মহাবিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আবিষ্কার করবে। নিশ্চিতভাবে তারা তখন পৃথিবীতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী প্রাণের উদ্ভব কিভাবে ঘটল সে সম্পর্কে আমাদের থেকে আরো বেশি জানতে পারবে।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমি যে বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে আসবো তা যদিও বিজ্ঞানভিত্তিক নয়, বা বিজ্ঞান-আলোচনাও নয়। তথাপি বিশাল সংখ্যক মানুষের আগ্রহের জায়গা এ বিষয়টি। সাধারণ মানুষেরা গভীর বিশ্বাসের জায়গা থেকে এ বিষয়টি দেখে, একই সাথে দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, সমাজতাত্ত্বিকদের অধ্যয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রও। বিষয়টি হচ্ছে জীববিবর্তনের সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসের সম্পর্ক। আরেকটু পরিষ্কার করে বললে বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। আলোচনা করা হবে বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ে কি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী না কি বন্ধুত্বসুলভ?

জীববিবর্তন ও ঈশ্বর
কেউ কি উভয়টিতে বিশ্বাস করতে পারেন?

আমার দৃষ্টিতে জীববিবর্তন আর ধর্মীয় বিশ্বাসকে পরস্পরের বিরোধী ভাবার প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান আর ধর্মকে যদি সঠিকভাবে বোঝা যায়, তবে এরা পরস্পরের বিরোধী হতে পারে না। কেননা এরা উভয়েই আলাদা আলাদা বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। বিজ্ঞান আর ধর্ম উভয়েই এই বিশ্বজগতকে দেখার জন্য ভিন্ন দুটি জানালা। দুটি জানালা দিয়ে একই জগতকে দেখা যায়। এদের মাধ্যমে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই জগতের পরিচয় মেলে। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিশ্বকে পরিচালনাকারী প্রক্রিয়াগুলোর সাথে সম্পর্কিত। যেমন, কিভাবে আমাদের মহাবিশ্বের মধ্যেকার গ্রহগুলো আবর্তিত হয়, পদার্থ ও বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলো কি কি, জীবের উৎস, বৈচিত্র্য এবং অভিযোজন কিভাবে ঘটে থাকে? ইত্যাদি। আর ধর্মের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এই বিশ্বজগত এবং মানব-জীবনের মর্মার্থ এবং উদ্দেশ্যের সাথে। কিংবা ঈশ্বর এবং মানুষে-মানুষে প্রকৃত সম্পর্ক, নৈতিক গুণাবলী যেগুলো মানুষের জীবনকে অনুপ্রাণিত করে, পরিচালনা করে। কিন্তু বিজ্ঞান ও ধর্মের সাথে 'আপাতদৃশ্য' অসঙ্গতিগুলোর উদ্ভব তখনই ঘটে যখন বিজ্ঞান কিংবা বিশ্বাস, কিংবা উভয়েই, তাদের সীমানা অতিক্রম করে একে অন্যের বিষয়ে নাক গলিয়ে দেয়।

বিজ্ঞান আমাদের জ্ঞান আহরণের একটি পথ, তবে তা একমাত্র নয়। অন্যান্য উৎস থেকেও জ্ঞান উৎসারিত হয়। সাধারণ অভিজ্ঞতা, রূপক সাহিত্য, চিত্রকলা, ইতিহাসও বিশ্বজগত সম্পর্কে 'বৈধ জ্ঞান' প্রদান করে। বিশ্বাসী মানুষের জন্য এই একই কাজটি করে প্রত্যাদেশ এবং ধর্ম। বিশ্বজগৎ এবং মানবজীবনের তাৎপর্য, একই সাথে

নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিজ্ঞানের আওতাধীন নয়। তা সত্ত্বেও এ বিষয়গুলো কারো কারো কাছে গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত তা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ন্যায় সমান গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

বিশ্বাসী মানুষের কাছে বিজ্ঞান ও ধর্মের সম্পর্ক হতে পারে পারস্পরিক উদ্দেশ্যসাধনকারী এবং অনুপ্রেরণাদানকারী। যখন আমরা মহাবিশ্বের বিশালতা দেখে, গৌরবময় জীববৈচিত্র্য আর আশ্চর্যজনক অভিযোজন এবং মানব-মস্তিষ্ক ও চেতনার অসাধারণ সব সৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হই, তখন বিজ্ঞান হয়তো ধর্মীয় বিশ্বাস-আচরণকে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে। ধর্ম মনুষ্যপ্রজাতি, প্রাণীকুল এবং প্রকৃতির সৃষ্টিকে সম্মান জানাতে উদ্বুদ্ধ করে। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম বিজ্ঞানী এবং অন্যদের জন্য একটি প্রেরণাদায়ী শক্তি হিসেবে কাজ করে এবং তা এই অনবদ্য মহাবিশ্ব সম্পর্কে অনুসন্ধানে এবং এর বিভিন্ন ধাঁধাসমূহের সমাধানে অনুপ্রেরণা যোগায়।

অনেক খ্রিস্টানের মতে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে জীববিবর্তন তত্ত্বের মেলবন্ধন সম্ভব নয়। কারণ তা বাইবেলে উল্লেখিত সৃষ্টির বর্ণনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বাইবেলের জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ে ঈশ্বর কর্তৃক বিশ্বজগত, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানবজাতি সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় মানুষ ও অন্যান্য জীবের বিবর্তনীয় বিকাশের সাথে জেনেসিসের আক্ষরিক ব্যাখ্যা অসঙ্গতিপূর্ণ বলেই প্রতীয়মান হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইনের '*অরিজিন অফ স্পিসিজ*' গ্রন্থটি প্রকাশের পরপরই কিছু খ্রিস্টান-ধর্মনেতা জীববিবর্তন এবং ঈশ্বর কর্তৃক জীবজগৎ সৃষ্টির এই আপাতদৃশ্য 'অসঙ্গতি'র একটি সমাধান দেখতে পেলেন। তাদের যুক্তি অনুসারে ঈশ্বর এ-ক্ষেত্রে মধ্যবর্তীর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে কাজ করেন। ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য এবং তার ভূমিকাকে স্বীকার করেই গ্রহগুলোর সৃষ্টি ও ঘূর্ণনকে মাধ্যাকর্ষণ সূত্র ও অন্যান্য প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একইভাবে

জীববিবর্তনও একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ঈশ্বর জীবের সৃষ্টি করেছেন এবং নিজ পরিকল্পনা অনুসারে তাদেরকে বিকশিত করেছেন। রচেস্টার থিওলজি সেমিনারি'র সভাপতি এ.এইচ. স্ট্রং ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত তাঁর *'সিস্টেমেটিক থিওলজি'* বইয়ে লিখেছেন, 'আমরা জীববিবর্তনের মূলনীতিকে অনুমোদন করি, তবে আমরা একে শুধুমাত্র স্বর্গীয় বুদ্ধিমত্তার কাজের পদ্ধতি হিসেবেই বিবেচনা করি।' তিনি আরো বলেন মানবজাতির পশুবংশীয় ইতিহাসের সাথে তাদের ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট প্রাণীর পদমর্যাদায় উত্তরণের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খ্রিস্টান লেখকদের বিরাট অংশ বিবর্তন তত্ত্বকে স্বীকার করে নেন। পোপ-দ্বাদশ পায়াস তাঁর *Human Generis* ('On the Human Race') নামের বিশ্বকোষ গ্রন্থে জীববিবর্তন তত্ত্বের সাথে খ্রিস্টীয় মতের সমন্বয় সাধন সম্ভব বলে মতপ্রকাশ করেন। পোপ দ্বিতীয় জন পল ১৯৯৬ সালের ২২ অক্টোবর *'যাজকীয় বিজ্ঞান একাডেমি'* আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বলেন : "বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক জ্ঞান থেকে আমাদের অনুধাবন হয়েছে যে জীববিবর্তন শুধুমাত্র একটি 'অনুকল্প' হিসেবে আবদ্ধ নয়। এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে এই তত্ত্বটি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ধারাবাহিক আবিষ্কারের ফলে গবেষকদের কাছে আরও বেশি করে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। এই আবিষ্কার কল্পিত কিংবা কারো দ্বারা বানানো নয়। বরং তা বিজ্ঞানীদের স্বাধীনভাবে কৃত কাজের ফসল, যা এই তত্ত্বের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি।"

জীববিবর্তন তত্ত্বের সাথে খ্রিস্টীয়-বিশ্বাসের সমন্বয় রয়েছে বলে অন্যান্য মূলধারার খ্রিস্টান সমিতিগুলোও মতপ্রকাশ করেছে বিভিন্ন সময়। ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত ইউনাইটেড প্রেসবিটারিয়ান চার্চের সাধারণ সভায় এই সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে যে, 'বাইবেল-বিশেষজ্ঞগণ এবং ধর্মীয় স্কুলগুলো... অনুসন্ধান করে দেখেছে যে জীববিবর্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাইবেলে বর্ণিত প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কিত

ব্যাখ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।' এমন-কী ১৯৬৫ সালে লুথেরান ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন আরও পরিষ্কারভাবে বক্তব্য দিয়েছে : "*জীববিবর্তনের সিদ্ধান্তগুলো আমাদের চারদিকে শ্বাসগ্রহণকারী বাতাসের মতোই অস্তিত্বশীল, এ থেকে পালিয়ে থাকার কোন সুযোগ নেই... বিজ্ঞান এবং ধর্ম উভয়ে এখানে থাকার জন্যই এসেছে এবং... তাদের উচিত একে অন্যের প্রতি একটি ভালো সম্মান প্রদর্শন করা।*"

একই ধরনের বক্তব্য এসেছে ইহুদি ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকেও। ১৯৮৪ সালে আমেরিকায় রাব্বিদের (ইহুদি ধর্মীয় নেতা) ৯৫তম কেন্দ্রীয় সভার বার্ষিক সম্মেলনে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যেখানে বলা হয়েছে : 'জীববিবর্তনের মূলনীতি ও ধারণাগুলো বিজ্ঞান-শিক্ষা ও বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মৌলিক বিষয়... তাই আমরা সকল প্রদেশের বিজ্ঞান-শিক্ষক ও স্থানীয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে আহ্বান করছি তারা যেন মানসম্পন্ন পাঠ্যক্রম তৈরি করেন যেগুলো আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে পুরোপুরি সাযুজ্যপূর্ণ এবং এগুলোতে যেন তথাকথিত 'সৃষ্টিবাদী' ধারণা অন্তর্ভুক্ত নেই।'

এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ের প্রায় ১২,০০০ হাজারেরও বেশি মার্কিন যাজকদের স্বাক্ষর করা একটি ঘোষণায় (Clergy Letter Project নামে পরিচিত) একই ধরনের বক্তব্য রয়েছে :

> "আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন ঐতিহ্য থেকে আসা যাজকগণ মনে করি যে বাইবেলের শাশ্বত সত্য এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো স্বাচ্ছন্দ্যেই সহাবস্থান করতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি জীববিবর্তন তত্ত্ব একটি শক্তিশালী ভিত্তিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক সত্য, যা কঠোর সন্দেহপ্রবণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সামনে উতরে গেছে এবং যার উপরে মানুষের আধুনিক জ্ঞানের অর্জনের অনেক কিছুই নির্ভর করে। এই সত্যকে অস্বীকার করা কিংবা একে 'আর দশটা নিছক তত্ত্বের মতো' মনে করে দূরে রাখার প্রবণতা হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা এবং তা

আমাদের শিশুদের মধ্যেও ছড়িয়ে দেয়ার নামান্তর। আমরা চাই বিজ্ঞান ও ধর্ম তাদের নিজস্ব অবস্থানে থাকুক, দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু সত্যের দুটি পরিপূরক রূপ।"

জীবের দৈহিক গঠনের পিছনে ঈশ্বরকে কৃতিত্ব দেবার একটি অসুবিধা হলো অসম্পূর্ণতা ও বিভিন্ন ত্রুটি জীবজগতকে দখল করে রেখেছে। মানুষের চোখের কথাই ধরুন। চোখের অক্ষিস্নায়ুর তন্তুগুলো এক বিন্দুতে মিলিত হয়ে অপটিক নার্ভ তৈরি করেছে, যা রেটিনাকে অতিক্রম করার সময় (মস্তিষ্কে পৌঁছানোর জন্য) একটি 'অন্ধ বিন্দু' তৈরি করে। এটা যদিও আমাদের চোখের একটি ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণতা কিন্তু (ঈশ্বর কর্তৃক পরিকল্পিত ভাবলে) এটি পরিকল্পিত নকশার অসম্পূর্ণতাও বটে। স্কুইড কিংবা অক্টোপাসের চোখে এ রকম কোনো ত্রুটি নেই। তাহলে কি আমরা বলতে পারি সৃষ্টিকর্তার মানুষের চেয়ে স্কুইডদের প্রতি মমতা বেশি? তাই তিনি স্কুইড-অক্টোপাসের চোখ আমাদের চোখের চেয়েও বেশি যত্ন সহকারে তৈরি করেছেন? আবার মানুষের চোয়ালের কথা ধরা যাক। চোয়ালের আকার তুলনায় আমাদের দাঁতের সংখ্যা বেশি। এ-কারণে প্রায়ই আমাদেরকে আক্কেল দাঁত ফেলে দিতে হয় এবং অন্য দাঁতগুলোও সোজা করার জন্য দন্তচিকিৎসকের কাছে দৌড়াতে হয়। ফলে ডাক্তারদের ভালো অর্থসংস্থান হয়। তাহলে আমাদের চোয়ালের এই গুরুতর ত্রুটির জন্য কি আমরা ঈশ্বরকে দায়ী করবো? আমরা জানি একজন প্রকৌশলী ব্যক্তিও কিন্তু এর থেকে ভালো ডিজাইন করতে পারবেন। জীববিবর্তনকে বিবেচনায় রাখলে আমরা এই অসম্পূর্ণতাগুলোর পিছনে দায়ী বিষয়টি ভালোভাবে চিহ্নিত করতে পারি; এবং এর প্রমাণও রয়েছে আমাদের কাছে।

বিশাল এ বিশ্বজগতের জীবের ত্রুটি আর অসম্পূর্ণতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। জীবজগৎ এমন সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে যথেষ্টভাবে পূর্ণ যেখানে শিকারি তার শিকারকে খেয়ে উদরপূর্তি

করে। যদি এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো মানবিক-নৈতিকতার চেয়েও অধিক উচ্চ নৈতিক অবস্থানে আসীন কোনো ব্যক্তি (ঈশ্বর) দ্বারা পরিকল্পিত হয়ে থাকে বলে আমরা বিশ্বাস করতে চাই, তবে সাথে সাথে ওই ব্যক্তিকে অত্যন্ত 'নিষ্ঠুর' বলেও স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতাগুলোকে রূপক অর্থে দেখতে পারি যদি একে আমরা 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে'র ফলাফল হিসেবে বিবেচনা করি। কেননা এখানে নৈতিকতার কোনো স্থান নেই।

ধর্মবিদরা অতীতে জীবজগতের অসম্পূর্ণতা, ত্রুটি আর নিষ্ঠুরতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এগুলোকে ঈশ্বরের পরিকল্পনাপ্রসূত বলে বিশ্বাস করলে ব্যাখ্যাদান অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) খুব সুচারুরূপে সমস্যাটিকে চিহ্নিত করেছিলেন :

'তিনি (ঈশ্বর) কি দুষ্টের দমনে ইচ্ছুক, কিন্তু সমর্থ নন?
সেক্ষত্রে তিনি সর্বশক্তিমান নন।
সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কি তিনি এ-কাজে অনিচ্ছুক?
তবে তিনি ঈর্ষাপরায়ণ।
তিনি কি একই সাথে সক্ষম এবং ইচ্ছুকও?
তবে অশুভের অস্তিত্ব কেন?'

জীববিবর্তন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ধর্মগুরু ওব্রে মুর ১৮৯১ সালে যেমনটা বলেছেন, *'ডারউইনবাদের আবির্ভাব ঘটেছে শত্রুর ছদ্মবেশ ধারণ করে, কিন্তু তা কাজ করেছে বন্ধুর ন্যায়।'* জীববিবর্তন তত্ত্ব প্রথম যেখানে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তাকে মুছে দিয়েছিল জীবজগত থেকে, কিন্তু এখন তা নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পিত জগতের সকল অসম্পূর্ণতার ব্যাখ্যাদানের প্রয়োজনীয়তাকেও মুছে দিয়েছে।

আমরা যদি দাবি করি জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং বিশেষভাবে তিনি পরিকল্পনামাফিক তৈরি করেছেন, তবে আমাদেরকে মানুষের চোয়াল, প্রস্রাবনালীর অপ্রশস্ততা, আমাদের

সোজা হয়ে হাঁটার জন্য প্রয়োজনের চেয়েও কম উপযোগী ও দুর্বলভাবে গঠিত মেরুদণ্ড—এ সবকিছুর জন্যেও ঈশ্বরকে দায়ী করতে হবে। বিশ্বাসী-মানুষদের জন্য তাই ভালো হবে ডারউইনের বৈপ্লবিক ধারণাকে স্বীকার করে নিয়ে জীবদেহের গঠনের পেছনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভূমিকাকে গ্রহণ করা, যা একই সাথে জীবজগতে বিরাজমান অসম্পূর্ণতা, অস্বাভাবিকতা, নিষ্ঠুরতা ও বিকৃত মানসিকতা উদ্ভবের পিছনে দায়ী। জীববিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক সরাসরি সৃষ্টি অথবা বিশেষ পরিকল্পনার পরিবর্তে এই সকল দুর্ঘটনার পিছনে প্রাকৃতিক নির্বাচনমূলক প্রক্রিয়াকে (যার কোন নিজস্ব নৈতিক তাৎপর্য নেই) দায়ী করা সম্ভব হয়।

জীবজগতে বিদ্যমান সকল ত্রুটি, অক্ষমতা, স্বজাতিভক্ষণ, পরজীবিতা, শিকার ও অন্যান্য তথাকথিত 'অশুভ কাজগুলোর' পিছনের ধর্মীয় ব্যাখ্যায় 'জীববিবর্তন তত্ত্ব' ভূমিকা রাখতে পারে। কিছু ধর্ম-অবিশ্বাসী লেখক এবং সমালোচকেরা যুক্তি দেখিয়েছেন প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে সংগঠিত বিবর্তন প্রক্রিয়া দ্বারা জীবজগতের সকল ত্রুটি, নিষ্ঠুরতা এবং বিকৃতি থেকে ঈশ্বরের দায় মুক্তি ঘটে না। ঈশ্বর এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা এবং এতে সংঘটিত সবকিছুর দায় শেষ পর্যন্ত তাকেই নিতে হবে, হোক তা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ কিংবা মধ্যবর্তী। ঈশ্বর যদি 'সর্বশক্তিমান' এবং 'দয়াময়' হয়েই থাকেন তাহলে সে যুক্তি অনুযায়ী তার পক্ষে এ-ধরনের নিষ্ঠুর, পরজীবীত্ব এবং মানুষের ব্যর্থতাহীন একটি বিশ্ব সৃষ্টি সম্ভব ছিল। সেটি কেন হয় নি?

একটি সম্ভাব্য উত্তর হলো ঈশ্বরের কাজগুলো আমাদের বোধগম্যতার অতীত এবং যেখানে মানুষের পক্ষে তার উদ্দেশ্যগুলো বোঝা সম্ভব নয় সেখানে ঈশ্বরকে তার কৃতকর্মের দায়ী করা তো দূরের ব্যাপার। অনেকের কাছে এই উত্তরটি সন্তোষজনক নয় কেননা এটা প্রশ্নের উত্তর দেবার পরিবর্তে প্রশ্নকেই মুছে ফেলে। তবে একটি ভিন্ন সম্ভাব্য উত্তর রয়েছে। প্রথমে সেইসব মানুষের কথা চিন্তা করুন যারা মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান, পরকীয়া এবং খুনের মতো সব ধরনের অশুভ

এবং পাপকর্মের সাথে জড়িত। বিশ্বাসীরা মনে করেন প্রতিটি মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্টি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে মানুষের সব ধরনের অপকর্ম ও বিধিবহির্ভূত কাজের জন্য ঈশ্বর দায়ী। পাপ হলো স্বাধীন ইচ্ছার একটি ফল; যার বিপরীত পৃষ্ঠে রয়েছে পুণ্য। খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের বিশদ ব্যাখ্যা মতে মানুষকে যদি তার সৃষ্টিকর্তার সাথে একটি সত্যিকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় তবে তাকে কিছুটা হলেও স্বাধীন ইচ্ছার অধিকার দিতে হবে। অনন্তকাল স্বর্গসুখের জন্য একটি পুণ্যময় জীবনযাপন করতে হবে। সমালোচকেরা বলতে পারেন এই যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের দায়মুক্তি ঘটে না কারণ তিনি মানুষকে 'স্বাধীন ইচ্ছাবিহীন' হিসেবে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু একজন যুক্তিসঙ্গতভাবেই দাবি করতে পারেন স্বাধীন ইচ্ছাবিহীন মানুষ খুবই ভিন্ন ধরনের একটি প্রাণী হতো, আজকের মানুষ তুলনায় কম আকর্ষণীয় এবং কম সৃষ্টিশীল হতো। এক্ষেত্রে রোবটের কথা চিন্তা করুন। রোবটেরা কখনো মানুষের ভালো বিকল্প হবে না, রোবটের পক্ষে ন্যায়পরায়ণ হয়ে কাজ করা সম্ভব নয়।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের গোড়াপত্তনের পূর্বে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা হতো ঈশ্বর বৃষ্টি, খরা, ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়ে মানুষকে পুরস্কার কিংবা শাস্তি প্রদান করে থাকেন। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্য ফল হলো ঈশ্বর ২০০৪ সালের শেষের দিকে (২৬ ডিসেম্বর) একটি ভয়ঙ্কর সুনামি সৃষ্টি করেছিলেন যার তাণ্ডবে দুই লক্ষ ইন্দোনেশীয় নাগরিকের মৃত্যু ঘটে এবং আরও দুই লক্ষেরও অধিক ব্যক্তি গৃহহীন হয়ে পড়ে। একজন সর্বকল্যাণময়-দয়াময় ঈশ্বরের ভাবমূর্তির সাথে এ ধরনের ঘটনা খাপ খায় না। যাহোক আমরা এখন জানি সুনামি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার কোনো 'নৈতিক অনিবার্যতা' নেই। সমালোচকরা আপত্তি তুলতে পারেন ঈশ্বর অন্য আরেকটি বিশ্ব তৈরি করতে পারতেন যেখানে কোনো প্রকার দুর্যোগ অনুপস্থিত। হ্যাঁ, বিশ্বাসীদের মত অনুযায়ী ঈশ্বর ভিন্ন একটি বিশ্ব সৃষ্টি করতে

পারতেন। কিন্তু তা কোনো সৃষ্টিশীল বিশ্ব হতো না। সৃষ্টিশীল মহাবিশ্বে অসংখ্য গ্যালাক্সি তৈরি হয়, নক্ষত্র এবং সৌরজগতের উদ্ভব ঘটে এবং মহাদেশগুলো সঞ্চারণশীল থাকে। আমাদের কাছে যে বিশ্বটি রয়েছে তা কোন নিশ্চল মহাবিশ্ব থেকে সৃষ্টিশীল এবং অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

এখন দৃষ্টি ফেরানো যাক মানুষের '*দুর্বলভাবে নকশাকৃত*' দুটি চোয়াল, মিলিয়ন সংখ্যক শিশুর প্রাণবিনষ্টকারী পরজীবীসমূহ এবং করুণভাবে 'নকশাকৃত' প্রজনন ব্যবস্থার দিকে, যা প্রতি বছর সংঘটিত হাজারো গর্ভপাতের জন্য দায়ী। এ-সব ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলো যদি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা এবং নকশার কারণে হয়ে থাকে, তবে এই ফলাফলগুলোর পিছনে ঈশ্বরকেই দায়ী বলা যায়। যেমন গাড়ি কোম্পানির প্রকৌশলীদের নকশায় তৈরি গাড়িটি যদি আপনি চাবি ঘোরানোর সাথে সাথেই বিস্ফোরিত হয়, তবে এর দায়-দায়িত্ব অবশ্যই প্রকৌশলীদের নিতে হবে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলো যদি জীববিবর্তন কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে তবে সেখানে কোনো নৈতিক দায় নেই, কেননা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোতে কোন ধরনের নৈতিকতার বাধ্যবাধকতা নেই। আবারো অনেকে প্রতিবাদ করতে পারেন এই বলে, চূড়ান্তভাবে ঈশ্বর নিজেই দায়ী কেননা তিনি এমন একটি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে পারতেন যেখানে নিষ্ঠুরতা, পরজীবিতা এবং অক্ষমতার কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বিবর্তনশীল জীবনের একটি বিশ্ব অনেক বেশি আকর্ষণীয়, এটি একটি সৃষ্টিশীল জগৎ যেখানে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে, জটিল বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশের সূচনা হয় এবং যেখানে মানুষ বিবর্তিত হয়েছে, হচ্ছে। জানি, আমার এই বক্তব্য অনেক বিশ্বাসী মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না এবং অনেক অবিশ্বাসীও এতে অকাট্য প্রমাণের অভাব দেখবেন। কিন্তু আমি মনে করি আমার এই অবস্থান অনেক বিশ্বাসী মানুষের জীববিবর্তন তত্ত্ব গ্রহণের জন্য একটি প্রচেষ্টা হতে পারে।

খ্রিস্টান বিশ্বাসীদের কেউ কেউ জীববিবর্তন তত্ত্বের বিরোধিতা করেন বিশেষত মানব-বিবর্তনকে, কারণ তারা বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়ের একটি আক্ষরিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করে বসে আছেন। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ক্রিয়েশন রিসার্চ সোসাইটি' তাদের কথিত 'বিশ্বাসের অবস্থানপত্রে' ঘোষণা দিয়েছে : *'বাইবেল হলো ঈশ্বরের লিখিত বাণী এবং তা সর্বদাই প্রেরণাদায়ীর ভূমিকা পালন করেছে। এর সকল বক্তব্যের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যতার সত্যিকার প্রমাণ রয়েছে। প্রকৃতি থেকে শিক্ষাগ্রহণকারী একজন ছাত্রের কাছে এর অর্থ হলো জেনেসিসে বর্ণিত মানুষ সৃষ্টির বর্ণনা ঐতিহাসিক সত্যসমূহের প্রামাণিক উপস্থাপন।'*

বেশ কয়েকবছর ধরে অনেক বাইবেল-বিশেষজ্ঞ এবং ধর্মনেতরা বাইবেলের আক্ষরিক ব্যাখ্যার অখণ্ডনীয়তাকে অস্বীকার করে আসছেন। কারণ এই গ্রন্থে অনেক সাংঘর্ষিক বক্তব্য রয়েছে। যেমন জেনেসিস পুস্তকের প্রথমভাগে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে দুটি ভিন্ন ভাষ্য রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের পুরোটা জুড়ে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমদিকের শ্লোকগুলোতে তুলনামূলকভাবে পরিচিত ছয়-দিনে বিশ্বসৃষ্টির ভাষ্য রয়েছে। যেখানে ঈশ্বর আলো, পৃথিবী, নভোমণ্ডল, মাছ, পাখি ও গবাদিপশু সৃষ্টির পর ষষ্ঠ দিনে মানুষকে (পুরুষ ও নারী উভয়কে) নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে একটি ভিন্ন ভাষ্য রয়েছে–'ঈশ্বর একজন পুরুষ মানুষকে সৃষ্টি করার পর একটি বাগান সাজালেন এবং পশুপাখিদের সৃষ্টি করলেন। তারপরে পুরুষ মানুষটির বুকের পাঁজরের হাড় থেকে একজন নারীকে তৈরি করলেন।'

এই দুটি ভাষ্যের মধ্যে কোনটি সঠিক, কোনটি ভুল? আমি বলবো এদের কোনটিই পরস্পরবিরোধী হবে না, যদি আমরা মনে করি এই দুটি ভাষ্যে একই বার্তা প্রদান করা হয়েছে যা হলো, এই মহাবিশ্ব এবং এর বাসিন্দা মানব জাতি ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। কিন্তু আমার মনে হয় না এই বক্তব্যগুলো 'ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সত্য' হতে

পারে যেমনটা ক্রিয়েশন রিসার্চ সোসাইটি তাদের কথিত 'বিশ্বাসের অবস্থানপত্রে' দাবি করেছেন।

বাইবেলের বিভিন্ন অংশে অসংখ্য পরস্পরবিরোধী ও অসঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইসরাইলের নির্বাচিত মানুষদের মিশর থেকে তাদের কাছে প্রতিশ্রুতিকৃত ভূমিতে ফিরে যাওয়ার বর্ণনা এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর চারদিকে সূর্যের পরিক্রমণকে সত্য বলে ঘোষণা দেওয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য গুরুতর ভুলগুলো না হয় বাদই দিলাম। বাইবেল-পণ্ডিতেরা যুক্তি দেখিয়েছেন–'ধর্মীয় সত্যের ব্যাপারে বাইবেলে কোন ভুল নেই। অপরদিকে পরিত্রাণের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বিষয়ে বাইবেলের বক্তব্যের আলাদা কোন মাহাত্ম্য নেই।' এ-কারণে খ্যাতিমান খ্রিস্টান পণ্ডিত অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০) তাঁর *De Genesi ad litteram (জেনেসিস বিষয়ে আক্ষরিক ভাষ্য)* বইতে বলেছেন, 'এটা প্রায়ই জিজ্ঞেস করা হয় আমাদের বিশ্বাস কেন শুধুমাত্র স্বর্গের আকার ও এর গঠন সম্পর্কিত হবে, পবিত্র পুস্তক মতে... যারা পরম আনন্দের সন্ধান করেন তাদের কাছে এ-ধরনের বিষয় আলাদা কোনো মাহাত্ম্য বয়ে নিয়ে আসে না। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটি হলো এই বিষয়গুলো চর্চার ফলে পরিত্রাণের জন্য আধ্যাত্মিকতায় মনোযোগী হওয়ার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়।"

এই যুক্তিটি গির্জার অন্যান্য প্রাচীন যাজকদের কাছ থেকেও এসেছে। অগাস্টিন আরো যোগ করেন, 'স্বর্গের গঠন ও এর বর্ণনা মানুষের পরিত্রাণের কোন কাজে আসবে না, বিধায় মহান বাণীসংগ্রাহকেরা এ-সম্পর্কে মানুষকে আসল সত্য শেখানোর ইচ্ছা পোষণ করেননি।' অগাস্টিন যা বলতে চেয়েছেন তা হলো, জেনেসিস জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন প্রাথমিক বই নয়। অগাস্টিনের পর্যবেক্ষণ অনুসারে জেনেসিসের বিশ্বসৃষ্টির ভাষ্যে ঈশ্বর প্রথমদিনে আলো সৃষ্টি করলেও চতুর্থদিনের আগে সূর্য সৃষ্টি করেন নি। অগাস্টিন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন জেনেসিসে উল্লেখিত 'আলো' এবং 'দিন' কোনো আক্ষরিক

অর্থ বহন করে না। বাইবেল শুধু ধর্মের সাথেই সম্পর্কিত এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রশ্নগুলোর সমাধানের জন্য বাইবেলের কোনো উদ্দেশ্য নেই।

বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একই ধরনের বক্তব্যও প্রদান করা হচ্ছে, যেগুলোর কিছু নমুনা আমি পূর্বেই দেখিয়েছি। সেই একই ধারাবাহিকতায় পোপ দ্বিতীয় জন পল ১৯৮১ সালে এক বিবৃতিতে বলেছেন, '*বাইবেল নিজেই মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং একে সাজানোর সাক্ষ্য দেয়। এটি কোন দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক-প্রবন্ধ হিসেবে মানুষের কাছে আসেনি। বরং তা মানুষের সাথে ঈশ্বরের এবং মহাবিশ্বের প্রকৃত সম্পর্কগুলোর বিষয়ে বর্ণনা দেয়। ঈশ্বর মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র এমন ঘোষণা দেয়াটাই এই পবিত্র পুস্তকের একমাত্র সাধারণ ইচ্ছা... মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও গঠনপ্রণালী সম্পর্কে অন্য যে কোনো শিক্ষার সাথে বাইবেলের উদ্দেশ্যের কোনো সঙ্গতি নেই। বাইবেলের শিক্ষা শুধু একজন মানুষ কিভাবে স্বর্গে যাবে তা নিয়েই, স্বর্গের সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে নয়।*'

অতএব উপসংহারে আমার উত্তর হলো : 'হ্যাঁ, একজন মানুষের পক্ষে জীববিবর্তন ও ঈশ্বর উভয়কেই বিশ্বাস করা সম্ভব।' জীববিবর্তন প্রচুর পরিমাণ সাক্ষ্য এবং প্রমাণসম্বলিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসীদের উচিত জীববিবর্তন তত্ত্বকে তাদের বিশ্বাসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা না করা। অনেক ধর্ম-পুরোহিত ও সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী রয়েছেন, যারা জীববিবর্তনকে বিবেচনা করেন ঈশ্বর কর্তৃক জীবজগতের অসাধারণ বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া হিসেবে। এ-কারণে আমি সেই ধর্মনেতা ওব্রে মুরের সাথে সুর মিলিয়ে বলতে চাই, 'জীববিবর্তন তত্ত্ব আসলে ধর্মের কোনো শত্রু নয় বরং বন্ধু।'

লেখক পরিচিতি

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আয়ালার পুরো নাম ফ্রান্সিসকো জোসি আয়ালা পিরেদা। প্রতিবেশবিদ্যা ও বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান বিভাগের ডোনাল্ড ব্রেন অধ্যাপক। একই সাথে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিজ্ঞানের দর্শন ও যুক্তিবিদ্যারও অধ্যাপক। আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান সংস্থা 'আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স'-এর সাবেক সভাপতি এবং বর্তমানে ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আয়ালা বিশ্বের জীববিজ্ঞানী মহলে 'বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের রেনেসাঁস মানুষ' বলে পরিচিত।

আয়ালার জন্ম স্পেনে ১২ মার্চ, ১৯৩৪ সালে। পিতার নাম ফ্রান্সিসকো আয়ালা এবং মায়ের নাম সোলেদাদ পিরেদা। ছোটবেলা থেকে তাঁর দীর্ঘ সময় কেটেছে চার্চের অধীনে নিয়ন্ত্রিত জীবনে। একসময় তিনি ডোমিনিকান চার্চের যাজকও হয়েছিলেন। তবে উচ্চশিক্ষার জন্য যাজকের পদ ছেড়ে দেন। ভর্তি হন স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের স্যালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে। গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন হওয়ার পর ১৯৬১ সালের দিকে পাড়ি দেন আমেরিকায়। সেখানে বিশ্বখ্যাত জীববিজ্ঞানী থিওডোসিয়াস ডবজানস্কি'র অধীনে পিইচডি করার জন্য কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। পিইচডি শেষে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিস ক্যাম্পাসে। বর্তমানে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের এরভিন ক্যাম্পাসে রয়েছেন।

১৯৭১ সালের দিকে ড. আয়ালা আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেন। আয়ালার স্ত্রী বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী হেনা আয়ালা। উভয়ে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের এরভিন শহরে বাস করছেন। জীববিজ্ঞানে বিশেষ করে বংশগতিবিদ্যায় ড. আয়ালা প্রচুর গবেষণা করেছেন। বিবর্তনের আণবিক ঘড়ি নিয়ে তাঁর গবেষণা এখনো অব্যাহত আছে। এছাড়া ডিএনএ এবং প্রোটিনের অনুক্রম নিয়েও কাজ করেছেন। জিনের কার্যাবলি এবং জিনের বিবর্তনীয় হার নির্ণয়ে তিনি নতুন মডেল তৈরি করে দিয়েছেন। তবে

আয়ালার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র হচ্ছে অতিক্ষুদ্র পরজীবী প্রোটোজোয়ার আরএনএ'র বিবর্তন, এর জিনের কার্যক্রম ও নিয়ন্ত্রণ। দক্ষিণ আমেরিকায় *Trypanosoma cruzi* নামের পরজীবী দ্বারা ভয়াবহ Chagas রোগের গবেষণায় তাঁর আবিষ্কার রোগ-প্রতিরোধ এবং প্রতিষেধক তৈরিতে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে।

২০০১ সালে ড. আয়ালা আমেরিকার সম্মানিত বিজ্ঞান-পদক ন্যাশনাল মেডেল অব সায়েন্স লাভ করেন এবং ২০১০ সালে পান টেম্পলেটন পুরস্কার। *আমেরিকান ইন্সটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস*'র তরফ থেকে ভূষিত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ডে। মার্কিন বিজ্ঞান সংস্থা ছাড়াও আয়ালা রাশিয়ার একাডেমি অব সায়েন্সের সম্মানিত সদস্য। একই সাথে তিনি ইটালি, স্পেন, মেক্সিকো, সার্বিয়ার বিজ্ঞান একাডেমিরও সম্মানিত সদস্য। চেক প্রজাতন্ত্রের বিজ্ঞান একাডেমি'র তরফ থেকে 'গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেল স্বর্ণপদক'ও পেয়েছেন তিনি। রাশিয়া, চীন, পোল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, চিলি, স্পেন, আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আয়ালাকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করেছেন। এছাড়া ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এরভিন ক্যাম্পাসের বিজ্ঞান পাঠাগারটি আয়ালার নামেই নামকরণ করা হয়েছে।

২০১০ সালের ১৮ অক্টোবর আয়ালা তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদকে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দান করার ঘোষণা দিয়েছেন। আয়ালার দৃষ্টিতে '*বিজ্ঞান আর ধর্ম কখনোই একে অপরের শত্রু নয়। একে অপরের প্রতিবন্ধক নয়। জ্ঞানের এ দুটো শাখার পথ আলাদা। তাই এদের একত্রে মিলিয়ে ফেলাও ঠিক নয়।*'